পঁচিশ বছরে অবিশ্রান্ত
সাংস্কৃতিক অন্তর্বহমান ‘সি’ পৃষ্ঠা ২

এক চীনা বুদ্ধিজীবীর বিচার–বিবেচনায়
‘চীন এবং সমাজতন্ত্র’ পৃষ্ঠা ৩

চেন গ্রামের অভিজ্ঞতায়
বিপ্লব থেকে বিশ্বায়ন [প্রথম অংশ] পৃষ্ঠা ৫

চীনের কমিউন পৃষ্ঠা ১৫

নিক্সনের চীন সফর
এবং সাংহাই ঘোষণাপত্র পৃষ্ঠা ২৫

বিষ–গর্ভা
পরিবেশ ও বনমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি পৃষ্ঠা ২৮

জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি ২০১০ ❒ একাদশ বর্ষ ❒ প্রথম সংখ্যা ❒ ৮ টাকা

মন্থন সাময়িকী

চীন : ফিরে দেখা

দুই দশকেরও বেশি সময় যাবৎ সমকালীন চীন ‘বাম এবং ‘অ–বাম’ আলাপ–আলোচনার জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। মূলস্রোতের অর্থনীতিবিদেরাও অনেকে চীনকে ‘উন্নয়নের এক নতুন মডেল’ বলে মর্যাদা দিতে চাইছেন। বিপরীত দিক থেকে আসছে তা নিয়ে সমালোচনা এবং তর্ক।

আমরাও আমাদের পত্রিকার পরিসরে সমকালীন চীন নিয়ে চর্চা করতে চাইছি। কিন্তু আমাদের চর্চার আগ্রহ কেবল ‘উন্নয়ন’ নিয়ে নয়, আশপাশে আরও নানান আগ্রহ আমাদের রয়েছে, যেটাকে আমরা বলতে পারি সমগ্রতায় দেখার চেষ্টা করা। স্বভাবত আমরা চীনের ইতিহাসকেও ফিরে অধ্যয়ন করতে চাইছি — চীনা সমাজ, চীন বিপ্লব, পুনর্গঠন, ভূমিসংস্কার, গণতন্ত্র, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, মাও চিন্তাধারা ও মাওবাদ — সেখান থেকে আসতে চাইছি সমকালীন বিশ্বপটে চীনের আলোচনায়। সেই আলোচনার সূত্র ধরে পরবর্তী সংখ্যায় আসবে চীনের জমি ও সম্পত্তি মালিকানায় বদল, অভিবাসী ও মহিলা শ্রমিক, শ্রমিক আন্দোলন, স্পেশাল ইকনমিক জোন, দেশি–বিদেশি পুঁজির রকমসকম, গণতন্ত্র, জাতিসত্তা ও সামাজিক আন্দোলন, বুদ্ধিচর্চা, সমকালীন বামপন্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। এই পত্রিকায় সাদাকালো অক্ষরে এতকিছু কতটা স্থান পাবে জানি না, তবে চর্চার গতিমুখটা এরকম।

এই ধরনের চর্চায় পুরনো একটা রেওয়াজ আজও লক্ষ্যণীয়। সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষেত্রে যেমন সমাজতন্ত্রের টিকে থাকা ও পতনকে স্তালিন–ক্রুশ্চেভ ইত্যাদি পর্বে ভাগ করে দেখা হয়েছিল, চীনের ক্ষেত্রেও মাও সেতুঙ, লিউ শাও চি, দেঙ শিয়াও পিঙ ইত্যাদি প্রথম সারির নেতাদের ধরে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলিকে ব্যাখ্যা করার রেওয়াজ আজও চলছে। আমরা এই রেওয়াজের বাইরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি; অর্থাৎ ব্যক্তির ভূমিকাকে খাটো না করেও একটা বস্তুগত বিচারকে প্রাধান্য দিতে চাইছি।

এই সংখ্যায় আমরা মূলত ‘ফিরে দেখা’র মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি। আশা করছি পাঠকদের সঙ্গে সংলাপের মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে আমরা চীনের সমকালের আলোচনায় প্রবেশ করতে পারব।

পঁচিশ বছরে অবিশ্রান্ত সাংস্কৃতিক অন্তর্বহমান 'সি'

তীর্থঙ্কর চন্দ

একটি নাটক — 'সি'। একটি নাট্যদল : শান্তিপুর সাংস্কৃতিক। পঁচিশ বছর আগে ওই 'সি' নাটকটির প্রথম অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক-এর আত্মপ্রকাশ। তারপর আড়াই দশক ধরে সাংস্কৃতিক পরিণত হয়েছে পশ্চিমবাংলার একটি সক্ষম স্বীকৃত নাট্যদলে। এবং বিস্ময়ের বিষয়, ওই 'সি' নাটকটি আজও ওই দলের বহু উচ্চ প্রশংসিত প্রযোজনাগুলির একটি। সে বড়ো কম কথা নয়। বহু প্রতিষ্ঠান, নাট্যপ্রযোজনাকারী বহু সংগঠনই পঁচিশ বছর পার হয়ে যায় সময়ের হিসেবেই। কেউ বা কোনভাবে টিকে থাকে, কেউ বা স্বীকৃতি আদায় করে নেয় বহু দর্শক-আলোচকের কাছে। কিন্তু যে নাটকটি প্রযোজনার মধ্য দিয়ে দল তার চলা শুরু করেছিল, সেই নাটকটি আজও সমান আদর সমান গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে দর্শকের কাছে, এটা একটা ঘটনা বৈকি! গোটা নদীয়া জেলায় সুপ্রতিষ্ঠিত বিতর্কিত নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রী মিন্টু মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই সাংস্কৃতিক-এর পথ চলা, প্রথম প্রযোজনা ওই 'সি' নাটকটির রচনাকার এবং পরিচালকও তিনিই। সত্তরের দশকে চারপাশে যখন হয় কেবলই রাষ্ট্র-ভজনা আর অন্যদিকে, রাষ্ট্রের স্বরূপ ব্যাখ্যায় হাজারো দল উপদলের পারস্পরিক কুৎসা আর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নামে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য খেউড়, আঘাত, যখন অনেকেই সমালোচনা পুস্তকটি হাতে নিয়েই চললেন রাজার বাড়ি ভোজ খেতে, তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দিলেন, মিন্টু মুখোপাধ্যায়ের মতো গুটিকয় মানুষ রইলেন নিজের বিশ্বাসের জায়গায় স্থির। সে বিশ্বাস ভুল না ঠিক সে আলোচনা চলতে পারে; কিন্তু তাঁরা, ওই গুটিকয় মানুষেরা কেবল তাঁদের বিশ্বাস নিয়ে ঢুকে পড়লেন না কীটদগ্ধ সব কেতাব ঘাঁটতে। সেই তর্ক-বিতর্কও চলল পত্র-পত্রিকায়, সভা-আলোচনায় আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সৃষ্টিতেও তাঁরা ধরে দিলেন সেই বিশ্বাসকে। সামান্য একটি ঘটনা প্রযোজনার অভিনবত্বে, প্রকাশের সহজ অথচ গভীর ভঙ্গিমায় অসামান্য হয়ে উঠল। কলকাতার একটি বহুতল বাড়ির ছাদের আলসেতে শুয়ে আছে একটি ছেলে। সে মরতে চায়। স্বাভাবিকভাবেই নিচে মানুষের জটলা বাঁধে, অবাক আশ্চর্য তারা, এ কী আশ্চর্য! ছেলেটি মরতে চায় কেন? আসে প্রশাসনের প্রতিনিধিরাও, আর ক্রমাগত প্রকাশ হতে থাকে জনগণের-প্রশাসনের-রাষ্ট্রের এবং কোন এক যুবকেরও জীবন-স্বরূপ। আর সেই প্রকাশের ভঙ্গিতে হিউমার জড়িয়ে থাকে পরতে পরতে, কখনও কখনও নিজের অজ্ঞাতেই হাত দিয়ে চোখের জলও মুছে নিতে হয়। এই নাটক 'সি'। সি ফর ক্যাপিটালিজম্। ওই ক্যাপিটালিজমেরই এক সার্বিক আক্রমণের ক্ষুদ্র একক প্রকাশ ওই 'সি' নাটকে। বলা বাহুল্য, নাটকটির স্রষ্টা-পরিচালক যাঁদের হাতে সাংস্কৃতিকের কাজের ভারটি সঁপে দিলেন একসময়, তাঁরাও যথেষ্ট সক্ষম। ওই পঁচিশ বছরের পরিক্রমায় নাট্যে সংযোজিত হয়েছে আরও বহু সময়ের প্রতিচ্ছবি। যে উগ্র হিন্দুত্ববাদ পঁচিশ বছরের শুরুতে ওইরকম দাঁত-নখ নিয়ে অতটা প্রকাশ্য হয়নি, ক্রমশ আসমুদ্র হিমাচল 'রাম-নাম'-কেই একমাত্র বীজমন্ত্র করে দেবার নির্বোধ অথচ তীব্র ভয়ঙ্কর সেই প্রক্রিয়াও এসেছে সময়ের হাত ধরেই, এসেছে একেবারে স্পষ্ট উলঙ্গ হয়ে যাওয়া 'শুয়োরের খোঁয়াড়'-এর মান্য প্রতিনিধিদের স্বরূপ, একই সঙ্গে এসেছে একেবারে সাধারণ 'সন্ধে দেওয়া ঘরের' অসহায়তা, অপরিবর্তিত বেদনার গল্প। আমরা দেখতে পাই, আবারও প্রমাণিত হয়, জীবনকে গভীর করে দেখা, তার কার্য-কারণ সূত্রগুলি স্পষ্ট উপলব্ধির সক্ষমতা আর তাকে সহজ এক প্রকাশের মধ্য দিয়ে, হাসির ভেতর দিয়ে যন্ত্রণার ছবি এঁকে দিলে, তা আজও গৃহীত, আদৃত হয়। সাংস্কৃতিক শান্তিপুরের 'সি' তার প্রমাণ। আমরা কৃতজ্ঞ শ্রী মিন্টু মুখোপাধ্যায়ের কাছে, শুরুতেই এমন একটি প্রযোজনা দিয়ে দলের গতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন বলে, যা আজও প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে সাংস্কৃতিক-এর মুখ্য নাট্যভাষ। আমরা অভিবাদন জানাই, অভিনেতা শ্রী বাবলা বসাক-কে, গত পঁচিশ বছর ধরে 'সি'-এর অসংখ্য অভিনয়ের প্রতিটিতে তিনি তাঁর চরিত্রে অভিনয় করেছেন যা সেদিন, ওই ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬-তে শান্তিপুরের পঞ্চরত্ন রোডে শ্রীমতী লীলা ভট্টাচার্যের বাড়ির রোয়াকে প্রথম অভিনয়ে যেমন সতেজ ছিল, আজ ২০১০-এর ৭ ফেব্রুয়ারির পঁচিশ বছর পূর্তি প্রযোজনাতেও তিনি তেমনই সতেজ, আরও পরিণত, যেভাবে প্রতিটি অভিনয়, দর্শকদের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা একজন অভিনেতাকে সমৃদ্ধ করে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, শ্রীমতী লীলা ভট্টাচার্য কেবল তাঁর রোয়াকটিই অভিনয়ের জন্য দেননি, তিনি নিজে তখনকার ওই একদল ছেলের চারপাশ বদলে দেওয়ার স্বপ্নকে লালন করেছিলেন, অভিনয় করেছেন মায়ের ভূমিকায়। পরে এই পঁচিশ বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় ওই মায়ের চরিতে অভিনয় করেছেন শ্রীমতী জয়শ্রী ভট্টাচার্য (রুবিদি), গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশাখা গোস্বামী এবং রাত্রি চট্টোপাধ্যায় — নদীয়া জেলায় এবং জেলার বাইরেও যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন স্বীকৃতি পেয়েছেন সক্ষম অভিনেত্রী হিসাবে। এমনি বিভিন্ন সময়ে আরও বহু অভিনেতা এসেছেন, অভিনয় করে গেছেন বিভিন্ন চরিত্রে, 'সি' নাটককে আজও সময়ের কাছে যৌবনের হিসাবে টগবগে রাখার কৃতিত্ব তাঁদেরও। আমাদের সবার বিনত শ্রদ্ধা তাঁদের প্রতি।

১৯৮৬ সালের পর থেকে শান্তিপুর সাংস্কৃতিক প্রযোজনা করেছেন ২১টি একাঙ্ক, ৪টি পূর্ণাঙ্গ, ৫টি পথনাটক, ১৩টি শিশুনাটক, ১টি পুতুল নাটক ও ৬টি শিশুদের পথনাটক। কেবল সংখ্যায় বিস্তৃত হওয়া নয়, সাংস্কৃতিক-এর প্রযোজনা নানাভাবে ঋদ্ধ করে আমাদের, তাঁদের স্বীকৃতি আজ পশ্চিমবাংলায় শুধু নয়, আসাম-গুজরাত-দিল্লি-লক্ষ্ণৌতে প্রকৃত নাট্যমোদী মানুষের কাছে তাঁরা শ্রদ্ধার, তাঁদের ভূমিকা বহুর কাছে শিক্ষকেরও। সাংস্কৃতিক-এর এখনকার কর্ণধার কৌশিক চট্টোপাধ্যায় — একাধারে নট-নাটককার-পরিচালক—নাট্যপ্রশিক্ষক। বাংলা নাট্যজগতের প্রতিষ্ঠিত জনেরাও তাঁর চিন্তা আর প্রকাশের ভঙ্গিকে মান্যতা দিয়েছেন সঠিকভাবেই। সাধারণ দর্শকজনেরা যাঁরা ছড়ানো এই বাংলাদেশে, বাংলাদেশের বাইরেও একাঙ্ক প্রতিযোগিতা মঞ্চে, সাংস্কৃতিক তাঁদের কাছে এক প্রিয়তম নাট্যদল। সাংস্কৃতিক আয়োজন করে ২৭ মার্চ বিশ্বনাট্যদিবস উপলক্ষে সারারাতের অনুষ্ঠান, নাট্যকোজাগরীর, আয়োজন করে নাট্য কর্মশালার, প্রকাশ করে নাট্যপত্র। গত বারো বছর ধরে আরও কয়েকটি দলের সঙ্গে মিলে তাঁদের আয়োজন শিশুকিশোর বিকাশ মেলা — সাতদিনের এক আবাসিক শিশুনাট্য-নাট্যবিষয়ক আরও বহু কিছুর এক কর্মশালা। এত সব কর্মকাণ্ডই যে একেবারে গোড়া থেকে চলছিল তা নয়, সময়ের তাগিদে তাঁরা আত্মস্থ করেছেন, তারপর সাড়া দিয়েছেন নিজেদের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী, নিজেদের সক্ষমতার দিকে তাকিয়ে। বলা হয়, যৌবনে স্থিত থাকতে পারে সেই মানুষ কিংবা সংগঠনও, আদান-প্রদানে যে যতটা নমনীয় আর নিজেকে প্রকাশের জন্য যে প্রতিদিন নিজেকে অতিক্রম করে যায়। শান্তিপুর সাংস্কৃতিক তেমনই এক চলমান যৌবনের উদাহরণ।

গত ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০, শান্তিপুর সাংস্কৃতিক উদ্‌যাপন করল তাদের পঁচিশ বছর। জেলা এবং জেলার বাইরে থেকে কত যে নাট্যবন্ধু উপস্থিত ওই প্রথম দিনের উদ্‌যাপনে। উপস্থিত থেকেছেন শ্রীমতী লীলা ভট্টাচার্যও। প্রচণ্ড শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করেছেন মনের কঠিন প্রত্যয়ে। উপস্থিত

... পরবর্তী অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

এক চীনা বুদ্ধিজীবীর বিচার-বিবেচনায়

‘চীন এবং সমাজতন্ত্র’

‘চীন এবং সমাজতন্ত্র’ নিয়ে মার্টিন হার্ট-ল্যান্ড্সবার্গ ও পল বার্কেটের আলোচনা যখন চীনা ভাষায় তর্জমা করে তাইওয়ানের চীনা ভাষার পত্রিকা ‘ক্রিটিক অ্যান্ড ট্রান্সফর্মেশন’-এ প্রকাশিত হল, পরের বেশ কয়েকটি সংখ্যায় এই রচনার ওপর বিচারমূলক অনেকগুলি লেখা প্রকাশিত হয়। রেবেকা ই. কার্ল এই লেখাগুলি থেকে ঝু দঙলি-র লেখাটি বেছে নিয়ে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। সেটি ‘ক্রিটিকাল এশিয়ান স্টাডিজ’-এর ‘ক্রিটিকাল পার্সপেক্টিভ্স অন চায়না’জ ইকনমিক ট্রান্সফর্মেশন’ নামে ২০০৭ সালে প্রকাশিত সংকলনে ছাপা হয়েছিল। ‘চীন এবং সমাজতন্ত্র’ নিয়ে মার্টিন হার্ট-ল্যান্ড্সবার্গ ও পল বার্কেটের প্রথম আলোচনাই এই সংকলনটির সমস্ত রচনার সূত্র। আমরা ঝু দঙলি-র রচনাটি বেছে নিয়েছি এই কারণে যে, তাত্ত্বিক দিক থেকে হলেও চীনের বিষয়টিকে তিনি ভিতর থেকে দেখেছেন। আমরা যারা কিছুটা দূর থেকে চীনকে দেখবার এবং বোঝবার চেষ্টা করছি, তাদের কাছে এটি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। এটি এখানে ইংরেজি থেকে বাংলায় তর্জমা করেছেন জিতেন নন্দী।

চীনের মূল ভূখণ্ডে যারা বাস করেছে এবং যারা সংস্কার ও উন্মুক্তির গত বিশ বছরও দেখেছে, সেই পর্যবেক্ষকদের কাছে এটা একটা প্রশ্ন, সমকালীন চীনকে নামে ‘পুঁজিবাদী’ এবং পদবিতে ‘সমাজতান্ত্রিক’ বলা যায় কিনা; যদিও ১৯৯০-এর মাঝামাঝি সময় থেকে এই প্রশ্ন তোলার অবস্থাটাও নেই। কারণ, ১৯৯০-এর দশক থেকে চীনা সমাজের অবস্থাটা একটা উক্তি দিয়ে বলা যায়, আধিপত্যকারী রাজনৈতিক ক্ষমতা + বাজার অর্থনীতি + বেসরকারিকরণ, একই সঙ্গে তা জন্ম দিয়ে চলেছে রাজনৈতিক দুর্নীতি, বড়োলোক ও গরিবের মধ্যে ভাগাভাগি এবং ব্যাপক ভোগের সংস্কৃতির। উপরন্তু, বিশেষভাবে এই “১৯৯০-এর দশকের পরিস্থিতি”-র ফলে “সমাজতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার স্ববিরোধ” সংক্রান্ত ধারণা — যেটা নিয়ে বেশ কয়েক বছর চুপিচুপি কথা চলত — এখন নাগরিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে নতুনভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে দেখা গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে, মার্টিন হার্ট-ল্যান্ড্সবার্গ ও পল বার্কেট-এর ‘চীন এবং সমাজতন্ত্র : বাজার সংস্কার এবং শ্রেণী সংগ্রাম’ (প্রথমে তা ‘মান্থলি রিভিউ’ পত্রিকার জুলাই-আগস্ট ২০০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, পরে চীনা ভাষায় অনুবাদ করে তাইওয়ানের ‘ক্রিটিক অ্যান্ড ট্রান্সফর্মেশন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়) রচনাটিও তার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে ওই প্রশ্নটিকে নিয়েছে যে, “চীনের মূল ভূখণ্ডের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা”-কে নামে ‘পুঁজিবাদী’ এবং পদবিতে ‘সমাজতান্ত্রিক’ বলা যায় কিনা এবং সেখানে এই সমস্যাটিকে ঘিরে পুরো আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় কিছুটা স্পষ্টতার অভাব রয়েছে, অন্তত চীনের মূল ভূখণ্ডের অধিকাংশ পাঠকদের দিক থেকে।

১

চীন বিপ্লব এল এবং বিদায় নিল। পিছনে ফেলে রেখে গেল সেই বিপ্লবের গুটিকয়েক আত্মিক অনাথকে[1]। বিপ্লব-পরবর্তী দীর্ঘ কঠিন অবস্থাটার মধ্যে ঠোক্কর খেতে খেতে তারা ক্ষইতে থাকল। সম্ভবত তাদের এখনকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, সেই ঐতিহাসিক প্রসঙ্গটাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করা। বিশেষত, এই অনাথেরা আধুনিক ইতিহাসের জটিল বিষয়টাকে বিপ্লবের আসা-যাওয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চায়। যদিও ‘চীন এবং সমাজতন্ত্র’ রচনায় ‘অর্থনৈতিক পরিবর্তন’-এর পুনরাবৃত্তি বিপ্লবের বিদায়েরই এক নির্মাণ মাত্র।

আধুনিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে, সমস্ত বিপ্লবের উৎপত্তিতে খানিকটা পরিবারগত মিল রয়েছে। কারণ যে রাজনৈতিক গোষ্ঠীই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্তরে তার পরাজয় ঘটেছে। সেই পরাজয় থেকে এসেছে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলির এক জট পাকানো অবস্থা। সেই অবস্থা থেকেই এসেছে জাতীয় বিপ্লব। এটাকে আমরা আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসের তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবের প্রেক্ষিত থেকে দেখতে পারি : ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স বিশ্ব-আধিপত্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। ফলে সাত বছরের যুদ্ধ বাধল। পরিণতি স্বরূপ ফ্রান্স তার উত্তর আমেরিকান ও ভারতীয় উপনিবেশগুলি হারাল আর ইংল্যান্ড এমন এক সাম্রাজ্য বিস্তার করল, যার সূর্য অস্ত যেত না। ইংরেজি হয়ে উঠল বিশ্ব-ভাষা। অন্যদিকে, এত দীর্ঘ যুদ্ধ করে, বিশেষত পরাজয়ের কারণে ফ্রান্স আর্থিক সংকটে নিমজ্জিত হল। শেষে ১৭৮৯-এর বিপ্লব ফেটে পড়ল। একইরকম ভাবে ১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়া সহজেই প্রাচ্যের বামনদের দেশের কাছে হার মানল। বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, রাশিয়ার গোটা নৌবাহিনী ডুবে ধ্বংস হল। ১৯১৪ সালে এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার যৌথবাহিনীর আক্রমণে রাশিয়া দ্রুত হারাল ২৫ লক্ষ সৈন্য; ভূখণ্ডের ১৫ শতাংশ, রেলপথের ১০ শতাংশ, শিল্পের ৩০ শতাংশ এবং জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। ১৯১৭-তে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ফেব্রুয়ারি এবং অক্টোবরে পরপর বিপ্লব ফেটে পড়ল। এই ঐতিহাসিক নিয়মটা আরও সত্য চীনের ক্ষেত্রে। ১৮৪০ থেকে বিশ্বের ক্ষমতাধরদের হাতে মার খেতে খেতে ১৯৪৯-এর বিপ্লব পর্যন্ত চীনের সভ্যতা চুরমার হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতিতে বিপ্লব উদ্গত হয়; তার পরিণতিতে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি ভয়ানক তীব্র হয়ে ওঠে। যদিও বিপ্লবের সাফল্যের পর দেশগুলি ‘স্থিতাবস্থা রক্ষা’র জন্য এক রক্ষণশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। ফ্রান্সে থার্মিডোরিয়ান প্রতিক্রিয়াপন্থীরা জ্যাকোবিনদের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে এবং তার ফলে নেপোলিয়ান সাম্রাজ্যের জন্ম হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরোধীদের সাফ করে দিয়ে স্তালিন আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্গঠন করেন। চীনের অসম্ভব দীর্ঘ বিপ্লবের সমাপ্তি ঘোষণা হয় শেষপর্যন্ত ১৯৭৬ সালে — ‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব’-এর চক্রীদের সাফ করে দিয়ে। বিপ্লবী শোধন প্রক্রিয়া এবং বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরে নতুন শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা আর সম্পদকে অভূতপূর্ব ভাবে আঁকড়ে ধরে। স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আভ্যন্তরীণ র‍্যাডিকাল রাজনৈতিক দাবিসমূহকে দমন করা হয়। একই সময়ে এই শাসকগোষ্ঠী তখন এক নতুন রূপ ধারণ করে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঙিনায় পুনঃপ্রবেশ করে। অতএব প্রত্যেক ঐতিহাসিক বিপ্লবের ফল আমরা দেখতে পেলাম : নেপোলিয়ান ইউরোপে বিস্তার লাভ করলেন; সোভিয়েত ইউনিয়ন মাতৃভূমির মহান যুদ্ধে জয়লাভ করে বিশ্ব-আধিপত্য কায়েমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল; আর চীন আজ তথাকথিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ অনুসরণ করে চলেছে।

বিপ্লবের আগে আমাদের আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে একটা পরাজয় ছিল। বিপ্লবের পরে আমরা দেখলাম নতুন শাসকগোষ্ঠী, তাদের হাতে বিপুল ক্ষমতা আর শক্তি। সেই তাকত নিয়ে তারা নতুন করে বিশ্ব-

[1] **ইংরেজিতে এখানে** spiritual orphan **কথাটি ছিল, যারা এখনও সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গটা নিয়ে ভাবে সম্ভবত তাদের কথা বলা হচ্ছে।** — **সম্পাদক**

প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঙিনায় প্রবেশ করছে। প্রত্যেক জাতিরাষ্ট্রে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এই হল বিপ্লবের গোড়ার কথা এবং তার ফলাফল। মোদ্দা বিষয়টা হল, আধুনিক সময়ে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামরিক লড়াইগুলি মূলত জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তিকাঠামোর মধ্যে অবস্থিত। সামাজিক শ্রেণীর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিপ্লব এই ধরনের লড়াইয়েরই এক বিশেষ প্রকাশ।

২

চীনের অর্থনৈতিক পরিবর্তন থেকে উদ্ভুত বহুবিধ সমস্যা এবং দ্বন্দ্ব নিয়ে 'চীন এবং সমাজতন্ত্র' আলোচনা করেছে। এই পরিবর্তন রপ্তানি বাণিজ্য, বিদেশি বিনিয়োগ, আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসম্পর্ক ইত্যাদি আরও বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। এইসব সমস্যা ও দ্বন্দ্ব ইতিমধ্যেই খবরের কাগজ এবং ইন্টারনেট ওয়েবসাইটের বহু বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে উঠেছে। যদিও 'চীন এবং সমাজতন্ত্র' নির্দিষ্ট, দুটি কারণে। প্রথমত, তার আলোচনা সুসম্বদ্ধ এবং সম্পূর্ণ; দ্বিতীয়ত, সেখানে চীনা সমাজকাঠামোর একটি আলোচনার স্তরে গিয়ে সামাজিক অর্থনীতির নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি তোলা হয়েছে; তারপর চীন এবং পূর্ব এশীয় অঞ্চলের দীর্ঘকালীন উন্নয়নের সম্পর্কের একটি আলোচনার স্তরে তা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 'চীন এবং সমাজতন্ত্র' রচনার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হল এই পরের আলোচনাটা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, হার্ট–ল্যান্ড্সবার্গ এবং বার্কেট মনে করেন বর্তমান চীনকে কোন পরিস্থিতিতেই আর সমাজতান্ত্রিক দেশ বলা যায় না। সেখান থেকে আর একটা প্রশ্ন উঠে আসে : চীন কি কখনও সমাজতান্ত্রিক ছিল? হ্যাঁ এবং না।

চল্লিশ বছর আগে, আঁকাবাঁকা 'উফ্যাঙ' কর্মসূচির অব্যবহিত পরে মাও সেতুঙ সোভিয়েত প্রকাশিত 'টেক্সটবুক অন পলিটিকাল ইকনমি' বিশেষ আগ্রহভরে পড়েছিলেন। উফ্যাঙের মধ্যে ছিল 'শতফুল বিকশিত হোক, শত চিন্তাধারার সংঘাত ঘটুক' এবং ১৯৫০–এর দশকের শেষ থেকে শুরু হয়ে ১৯৬০–এর দশকের গোড়া পর্যন্ত 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড', এই দুই কর্মসূচি। ওই বইটির ওপর মাওয়ের বহু টীকা ও মন্তব্য নিয়ে লেখা হয়েছিল 'মাও সেতুঙ'স ক্রিটিকাল অ্যানোটেশন্স অফ অ্যান্ড টক্স অন সোশালিস্ট পলিটিকাল ইকনমি'। মাওয়ের বইটি এখনও সম্পূর্ণ ছেপে বার হয়নি। তা সত্ত্বেও জীবনের পরের দিককার মাও চিন্তার এটি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সূত্র। সোভিয়েতের বইটির ২৩তম অধ্যায়ে ১৯৩৬ সালের নতুন সংবিধান নিয়ে একটি আলোচনা ছিল। এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, সোভিয়েত নাগরিক অথবা প্রলেতারিয়েত কতরকম নতুন অধিকার ভোগ করে — যার মধ্যে রয়েছে কাজ, অবসর, শিক্ষার অধিকার এবং বার্ধক্য, অসুস্থতা অথবা শ্রমক্ষমতা হারিয়ে ফেললে সুনিশ্চিত ভরণপোষণের ব্যবস্থা। এই অংশে মাও সুনির্দিষ্টভাবে মন্তব্য করেছিলেন : "সবচেয়ে বড়ো অধিকার হল রাষ্ট্রের পরিচালনার অধিকার।" তিনি আরও বলেছিলেন, "এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমজীবী মানুষের বহু অধিকার ভোগের কথা বলা আছে, কিন্তু তার মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্র, সামরিক, শিল্প, সংস্কৃতি ও শিক্ষা পরিচালনার কোন কথাই নেই। বাস্তবে, এই অধিকারগুলি একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের ভোগ করা উচিত; এগুলো সবচাইতে মৌলিক অধিকার। এগুলোকে বাদ দিয়ে কাজ, অবসর, শিক্ষা ইত্যাদি অধিকারের দীর্ঘকালীন কোন নিশ্চয়তা নেই।"

সোভিয়েত বইয়ের ওপর এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবে চীনা পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও সত্যি। সেই সময় নিঃসন্দেহে চীনের সামাজিক–অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা দূর পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক চরিত্র ছিল, যতদূর পর্যন্ত উৎপাদনী সম্পদ জনগণ অথবা সামাজিক সমষ্টির হাতে ছিল, যতটা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা মুনাফার বদলে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্থির হত এবং সেই উৎপাদন ছিল একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী ইত্যাদি। চীনা নাগরিক এবং শ্রমিকেরা সোভিয়েত বইয়ে তালিকাভুক্ত নির্দিষ্ট সামাজিক–অর্থনৈতিক অধিকারগুলি হয় ভোগ করত কিংবা শীঘ্রই ভোগ করতে চলেছিল। একই সময়ে এই অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি তারা স্পষ্টতই "রাষ্ট্র, সামরিক, শিল্প, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার পরিচালনা"র মতো সামাজিক–রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তখন ওপর থেকে একদল লাল–প্রশাসক (অর্থাৎ যারা কমিউনিজমে বিশ্বাস করত) চীনকে পরিচালনা ও শাসন করত। সমস্যাটা হল, এই বিশ্বাসের লাল রঙ কখনও ফিকে হয়ে যাওয়া নিয়ে। তা ক্রমশ 'সাদা' হয়ে গেল আর 'সাদা' রঙটাও ক্রমান্বয়ে 'কালো' হয়ে যেতে থাকল। এই কারণে চীনের সমাজতন্ত্র সেই সময় মোটেই সম্পূর্ণ ছিল না, বড়ো জোর একে 'জাতীয় সমাজতন্ত্র' গোছের বলা যেত; অবশ্যই তা 'জনগণের সমাজতন্ত্র' ছিল না।

তাই জাতীয় সমাজতন্ত্রকে জনগণের সমাজতন্ত্র হয়ে ওঠার দিকে ঠেলার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই কয়েক বছর পরে মাওয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করেছিল। মাওয়ের কথা অনুযায়ী "জনগণ নিজেরাই উপরিকাঠামোকে নির্দেশ করবে।" এ কারণে প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনা কেবল একটি গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন নয়, বরং তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার টিকে থাকা ও চালিয়ে যাওয়ার মূল নিশ্চয়তা।

'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' ব্যর্থ হওয়ার সামান্য পরেই চীনা সমকালীন ইতিহাসের 'নতুন যুগ' আত্মপ্রকাশ করল। তার পর থেকে চীনের রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের আগের ব্যবস্থাটা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে এক মিশ্র অর্থনীতিতে পরিণত হল। তার মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠল। এই রূপান্তর ১৯৯২ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হল। শ্রমিকেরা আগে যে সমস্ত অধিকার ভোগ করত — কাজ, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং অন্যান্য সামাজিক–অর্থনৈতিক অধিকার — তা হারিয়ে গেল। এ থেকে কারও পুরনো জমানার মাওয়ের সতর্কবাণী মনে আসতে পারে। পাশাপাশি, বিপরীত দিক থেকে এবং সপক্ষে, জনগণের মধ্যে মাও সেতুঙ চিন্তাধারার পুনরাবির্ভাব ঘটল এবং বুদ্ধিজীবীরা ক্রমান্বয়ে সামান্য বামদিকে সরে গেল।

৩

সমস্ত ব্যবস্থাগত বিন্যাস হল বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর শক্তি এবং আপস–মীমাংসার ফলাফল। এখন আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, এটা জনগণেরই দুর্বলতার প্রকাশ। ঘটনাটা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গোড়া থেকেই আদতে দেখা গেছে, যখন বিভিন্ন গণসংগঠনগুলি একটা ডামাডোল আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিল। সেখান থেকে শুরু হয়ে আজকের মুহূর্ত পর্যন্ত তার লক্ষণ হল শ্রমিক এবং কৃষক জনগণের নীরবতা এবং নিষ্ক্রিয়তা।

দুর্বলতা হল এমন এক বাস্তবতা যা দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকবে। এই অবস্থায় "শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজন এবং সক্ষমতা অনুযায়ী একটা নীতি গড়ে তোলা"র কথা (যেটা হার্ট–ল্যান্ড্সবার্গ এবং বার্কেট তাঁদের রচনার চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন) মনে হয় ফাঁকা কথা। কেননা আজকের সমাজ কাঠামোয় — যেখানে আমলা, উৎপাদক এবং বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তিনটি উচ্চমহল একটা আঁটোসাটো ঐক্য তৈরি করেছে — মূল সামাজিক–রাজনৈতিক গতিমুখের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনাই আদপে নেই। যদি দুর্বলতার বাস্তবতায় মৌলিক কোন বদল না ঘটে, তাহলে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলির জটিলতার কারণে আর একটা নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত সমাজবিপ্লবের বিস্ফোরণ সেই একই বিপ্লবী "প্রেক্ষিত ও

ফলাফল''–এর চক্রের পুনরাবৃত্তিতে শেষ হবে (যেটা আগে বলা হয়েছে)।

আজ এবং আগামী বেশ কিছুকাল পর্যন্ত জাতিরাষ্ট্রগুলি বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল প্রতিষ্ঠান থেকে যাবে। কারণ ওগুলি নিছক কিছু উত্তর–আধুনিক তাত্ত্বিকের ''কল্পিত কৌমসমাজ'' নয়। চীনকে উদাহরণ হিসেবে ধরলে বলা যায়, যদি এখনকার পর্যায়ের আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় যোগদান পরাজিত হয়, তাহলে আমরা আর একটা জনগণের বিপ্লবের মুহূর্ত দেখতে পারি। যদি পেন্ডুলামের কাঁটা ফের সেদিকে ঘুরে যায়, জনগণ অন্তত আর একবার ইতিহাসের দখল নেওয়ার সুযোগ পাবে। যদিও একই সঙ্গে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পূর্ব এশিয়ার বিরাট ভূমিকার পতন হয়, তাহলে তার প্রভাবে প্রায় নিশ্চিতভাবে একটা সাধারণ বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের জন্ম হবে। কিন্তু যদি আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চীনের পুনরায় যোগদান টিকে যায়, সেক্ষেত্রে বিশ্বের সংস্থান, বাজার, সম্পদ এবং ক্ষমতার পুনর্বন্টন হবে। ১০০ কোটির বেশি মানুষের এক বিশালাকায় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চীন তখন সম্ভবত পাঁচশ বছরের পশ্চিমি আধিপত্যের বিশ্বজোড়া চালু নকশাটাকে বদলে দেবে। অর্থাৎ ১৪৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের সময় থেকে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং পরবর্তীকালে বিশ্ব বৈষম্য গড়ে ওঠার কাঠামোটাকে মৌলিকভাবে বদলে দিতে পারে। সেটা তখন হবে আধুনিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমাপ্তির মুহূর্ত এবং সেই মুহূর্তে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও প্রয়োগ সমেত নানান সামাজিক শক্তি একটা আদ্যপান্ত নতুন সুযোগ পাবে। এই দুই সম্ভাবনা — যা ভিন্ন ভিন্ন পথে একই লক্ষ্যে পৌঁছবে — সম্ভবত সমকালীন অর্থনৈতিক রূপান্তরের ''গুরুত্বপূর্ণ বিষয়''।

চেন গ্রামের অভিজ্ঞতায়

বিপ্লব থেকে বিশ্বায়ন [প্রথম অংশ]

অনিতা চ্যান, রিচার্ড ম্যাডসেন এবং জোনাথন আঙ্গার–এর বই 'চেন ভিলেজ : রেভোলিউশন টু গ্লোবালাইজেশন' থেকে চেন গ্রামের বৃত্তান্ত এখানে পেশ করা হল। লেখকেরা দক্ষিণ চীনের একটি গ্রামে ধারাবাহিকভাবে ১৯৭৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়েছেন। গ্রামটির আসল নাম গোপন রেখে একটা ছদ্মনাম 'চেন' ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে ওঁরা কথা বলতে শুরু করেছিলেন হঙকঙে কাজ করতে আসা ওই গ্রামের অভিবাসী মানুষের সঙ্গে। পরে ১৯৮৮–৯০ সালে ওঁরা গ্রামটিতে যান। আমরা এখানে প্রথম অংশে ১৯৪৯ সালের বিপ্লব থেকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব অবধি বিবরণ প্রকাশ করছি। পরে দ্বিতীয় অংশে আমরা বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত বিবরণ প্রকাশ করব। এটি ইংরেজি থেকে সম্পাদনা ও সংক্ষেপ করে বাংলায় তর্জমা করেছেন জিতেন নন্দী।

গ্রামের নাম চেন। দক্ষিণ চীনের গুয়াঙদঙ প্রদেশের অতি সাধারণ একটি গ্রাম। দূর থেকে দেখলে একটা ছবির মতো : সারিবদ্ধ পাহাড়ের কোলে সোনালি ফসলে ভরা মাঠের মাঝে পুকুরে ঘেরা ছোট্ট গ্রাম। কাছে গিয়ে দেখলে অবশ্য অন্যরকম — বর্ষার কাদায় প্যাচপ্যাচে সরু পথগুলো আবর্জনা আর গোবরে পিছল; বেশিরভাগই মাটির ঘর, মাত্র গুটিকয়েক ইটের গাঁথনি তোলা পাকা দালান।

চারশ বছর আগে পাশের কোন জেলা থেকে একদল মানুষ নিজেদের কুলসমাজের বসত ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। সেখানকার গ্রামে ওই কুলের স্বজাতির সংখ্যা এত বেড়ে গেল, পরের প্রজন্মের আর সেখানে ঠাঁই মিলল না। তারা দেখেশুনে এখনকার চেন গ্রামের পাশে নদীর ওপারের উৎকৃষ্ট জমিতে এসে বাসা বাঁধল। কিন্তু জমি নিয়ে অশান্তি লাগল পাশের গ্রামের বাসিন্দা আর এক কুলসমাজের সঙ্গে। সেই সময় চেনরা ঝগড়ায় পেরে উঠল না। অগত্যা তারা পাহাড়ের দিকে অপেক্ষাকৃত খারাপ জমিতে সরে গেল। সেখানেই পত্তন হল চেন গ্রামের। বাপদাদাদের মুখ থেকে গ্রামের পুরনো ইতিহাস এতটুকু জানা গেছে।

আরও জানা গেছে, ১৯৪৯ সালে বিপ্লবের আগে গাঁয়ের অবস্থার কথা। প্রতিবেশী গ্রামগুলোর অত্যাচার সহ্য করতে হত বরাবর। প্রতিবেশী ধনী গ্রামের বড়ো জমিদারদের কাছে নামমাত্র মজুরিতে খাটতে যেত গাঁয়ের মরদেরা। অভাবের সময় কোন কোন পরিবারকে ভিক্ষাও করতে হত; পথে পথে মারা গেছে কত বয়স্ক মানুষ; এমনকী অভাবের তাড়নায় কোন পরিবার ছেলেপুলে পর্যন্ত বিক্রি করেছে। এছাড়া, ডাকাত, চিয়াং কাইশেকের কুয়োমিনটাঙ সরকার আর জাপ–দস্যুরা গাঁয়ে এসে লুটপাট চালাত। বাইরের লুঠেরাদের উৎপাত আর স্থানীয় জমিদারদের উৎপীড়নে গ্রামের জনসংখ্যা ক্রমেই কমে আসছিল। বিপ্লবের আগেই তা অর্ধেকে নেমে এল। শহরে কাজ করতে যাওয়া এক চেন যুবক তো বলেই ফেলল — 'গাঁ প্রায় খালি হয়ে আসছিল। আর এক বছর পরে যদি বিপ্লব হত, গাঁ বেমালুম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।' যদিও অন্য তিন প্রবীণ চেন কিছুটা ভিন্ন কথা বলেছিলেন। ওঁরা ছিলেন গরিব চাষি পরিবারের মানুষ, চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি গ্রাম ছেড়ে এসেছিলেন। ওঁরা বলেছিলেন চেন গ্রামের সাহসিকতার গল্প; ত্রিশের দশকে গাঁয়ে এমন ঘটা করে উৎসব পালন হত, অন্য গাঁয়ের মানুষ হিংসে করত।

বাপঠাকুর্দার মান রাখতে চেনের মানুষ ইটের গাঁথনি দিয়ে পেল্লায় এক হলঘর বানিয়েছিল গ্রামে। সেই হলঘরে পাথরে খোদাই করে রাখা হয়েছিল চেন–কুলের বংশলতিকা। এছাড়া, যারা নিজেদের আলাদা আলাদা কুল–শাখার বংশগৌরব দাবি করত, তারাও বংশের নামে আলাদা হলঘর বানিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত ছোটো এরকম আরও পাঁচটা হলঘর ছড়িয়ে–ছিটিয়ে ছিল গ্রামের মধ্যে। এক বৃদ্ধ বলেছিলেন — 'চেন গাঁয়ের একজোট শক্তির জন্য পড়শি গাঁয়ের লোকেরা পিছনে লাগতে সাহস পেত না।'

গ্রামের পিছনে সারিবদ্ধ পাহাড়ী এলাকা ছিল ডাকাতদের নিরাপদ আস্তানা। ১৯৪০–এর দশক থেকে কমিউনস্ট গেরিলারা সেখানে আশ্রয় নেয়। এরা প্রথমে জাপানিদের সঙ্গে লড়ত। পরে লড়ল কুওমিনটাঙের সঙ্গে। হঙকঙের প্রবাসী প্রাচীন চেনদের কুওমিনটাঙ নিয়ে তিক্ত স্মৃতি রয়েছে। গাঁয়ের খেতে যখন ফসল উঠত, কাছাকাছি বাজার–শহর থেকে কুওমিনটাঙ সৈন্যরা সেই ফসল লুটে নিয়ে যেতে গাঁয়ে এসে উপস্থিত হত। অথচ কমিউনিস্ট গেরিলারা ছিল অন্যরকম। এক বৃদ্ধের স্মৃতিতে — 'ওরা কিছু নিত না, এমনকী খাবারটুকুও নয়। আমরা অবাক হয়ে যেতাম, কোথা থেকে ওরা খাবার পেত। ওরা ছিল আমাদেরই মতো চাষি। পাহাড়ের জমিতে কাজ করতে গেলে কখনও সখনও ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। মাঝেমধ্যে ওরা রাতে গাঁয়ে এসে থাকত।'

গাঁয়ের গরিব জোয়ান ছেলেদের মধ্যে যারা একটু ডাকাবুকো ছিল, তাদের জনাছয়েক গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। হয়তো এদের কেউ কেউ আগে দস্যুবৃত্তিও করেছে। কমিউনিস্টরা বলেছিল, লড়াই করে তারা সব কিছু বদলে দেবে।

উনিশ'শ পঞ্চাশের দশক

উত্তর চীনে কমিউনিস্ট বাহিনীর জয় হল। একবছর পর ১৯৪৯ সালে লিন

পিয়াওয়ের বিজয়ী বাহিনী দক্ষিণের দিকে যাত্রা করল। ওরা যখন গুয়াঙদঙ প্রদেশে এল, নতুন কমিউনিস্ট সরকার কয়েকজন ক্যাডারকে পাঠাল চেন গ্রামে, ভূমি সংস্কারের জন্য। জমি পুনর্বন্টন করার নির্দেশের পাশাপাশি গ্রাম্য মাতব্বরদের ক্ষমতাকে ভেঙে দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এই কাজে গ্রামের গরিবদের ঘৃণা ও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটার দরকার ছিল। ফলে এতকালের বংশগত বন্ধনকে পাশে সরিয়ে রাখার দরকার হল। কেননা এবার নিজেদের স্বজাতির ওপরই আঘাত হানতে হবে, শিখতে হবে কেমন করে 'শ্রেণীঘৃণা' উগরে দিতে হয়।

কিন্তু বহু পরিবার এই ক্যাডারদলের সঙ্গে সমঝোতা করতে চাইল না। পুরুষানুক্রমে চাষিরা বাইরের লোকেদের সন্দেহ করে এসেছে। অপেক্ষাকৃত গরিব চাষিরা ভূমি সংস্কারে সবচেয়ে বেশি লাভবান হত। শোনা যায়, ধনী পরিবারের লোকেরা নিজেদের এতদিনকার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এদের ওপর অত্যাচার করেছিল।

চেন সুমেই নামে এক যুবক পাহাড়ে কাঠ কেটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিক্রি করত। সে গোপনে কমিউনিস্টদের হয়ে কাজ করত, তাদের খবরাখবর দিত। একটা গল্প শোনা যায় : 'এই অঞ্চলে যখন ভূমি সংস্কার হল, জমিদারদের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস কারও ছিল না। ... কিন্তু চেন সুমেই জানত, গাঁয়ে কারা সবচেয়ে গরিব আর কাদের সংগঠিত করা সম্ভব। সে কিছু গরিব চাষিকে একজোট করল জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য ... সে-ই চাষিদের সমাজপতি হওয়ার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিল। এব্যাপারে তার নামডাকও হল বেশ!'

জমিদারেরা এদের হাতে নাকাল হল। তাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সামান্য জমি ছেড়ে দিয়ে বাকিটা কেড়ে নেওয়া হল। চেন গাঁয়ে ছিল দুই জমিদার আর পাঁচ ধনী চাষি পরিবার। এই পাঁচ পরিবারের মধ্যে আবার তিন পরিবার একই পরিবার থেকে আসা — এক বাপ আর তার দুই বিবাহিত ছেলের পরিবার। অবিভক্ত পরিবারটির হাতে আসলে জমিদার দুজনের চেয়েও বেশি জমি ছিল। এরা মজুর লাগিয়ে চাষ করার পাশাপাশি নিজেরাও জমিতে খাটত — গ্রাম্য জমিদারদের গতর না খাটানোর রেওয়াজ মানত না। ১৯৫০ সালের ভূমি সংস্কার বিধি অনুযায়ী, ধনী চাষিদের বেশিরভাগ জমি কেড়ে নেওয়া হয়নি, তাদের জমিদারদের মতো লাঞ্ছিত হতে হয়নি। এতে তখনকার মতো চীনা অর্থনীতি লাভবান হল। কারণ ওই ধনী চাষি পরিবারদের জমিতে ফলনের হার ভালো ছিল। চাষিরা খাজনা না দিতে পারলে জমিদারেরা পেটাত। কিন্তু চেন গাঁয়ের এই ধনী চাষি পরিবারটি গরিব পরিবারের লোকেদের প্রতি ছিল অপেক্ষাকৃত সহানুভূতিশীল। ফলে গরিবদের মধ্যে তাদের প্রতি ছিটেফোঁটা সম্মান বজায় ছিল।

ভূমি সংস্কারের ফলে গ্রামে সকল পরিবারের গায়ে একটা 'শ্রেণী' তকমা এঁটে গেল। পুরনো জমিদার আর ধনী চাষিরা শ্রেণীবিচারে দাঁড়াল 'খারাপ'। তার নিচে পুরনো উচ্চ-মধ্য আর মধ্য-মধ্য চাষি পরিবারদের রাজনৈতিক বিচারে সন্দেহজনক মনে করা হত না বটে। কিন্তু পুরনো নিম্ন-মধ্য আর গরিব চাষিরা পড়েছিল 'লাল শ্রেণী'র সারিতে। পরবর্তী দশকে কোন প্রশাসনিক কাজে সরকার এই শ্রেণীর লোকেদের প্রাধান্য দিত।

চেন গাঁয়ে পুরনো গরিব আর নিম্ন-মধ্য চাষিরা ছিল জনসংখ্যার বিচারে ৮০-৮৫%। কিন্তু তা হলে কী হবে? পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়, এইসব পরিবারের পুরুষেরা ছিল প্রায় সকলেই নিরক্ষর। স্বনির্ভর মধ্যচাষিদের মতো চাষের পরিকল্পনা করার অভিজ্ঞতা এদের মোটেই ছিল না। এদিকে নতুন নেতা চেন সুমেই আর তার গেরিলা বাহিনী ভূমি সংস্কারের পর বেশিদিন গ্রামে রইল না। কমিউনিস্টদের কাছে এই ধরনের যুবকদের চাহিদা ছিল খুব বেশি। তাদের উঁচু পদ দিয়ে গ্রামের বাইরের কাজে টেনে নেওয়া হল। চেন সুমেই শেষপর্যন্ত জেলার কৃষি যন্ত্রপাতি কারখানার প্রধান মনোনীত হল। তার ফলে মধ্যচাষি পরিবারের এক যুবক চেন ফেইহান হল পার্টির সম্পাদক। সে ছিল একজন ভালো চাষি, লেখাপড়াও জানত। ফলে পার্টির নির্দেশিকা পড়ার মতো জ্ঞানগম্মি তার যথেষ্টই ছিল।

যৌথ চাষ

ইতিমধ্যে গরিব চাষি পরিবারগুলি জমি পেয়েছে। কুলসমাজের জমিজায়গা আর হলঘরগুলোও এখন তাদের জিম্মায়। সেই হলঘরে আর এখন বাৎসরিক আচার-অনুষ্ঠান হয় না, সেগুলো বারোয়ারি গুদামঘরে পরিণত হয়েছে। জমি পুনর্বন্টন হলেও সবার হাতে সমান জমি নেই। মধ্যচাষিদের তুলনায় গরিবদের হাতে জমি কম রয়েছে। আর সেটুকু জমি চাষ করার মতো চাষের উপকরণ বা বলদ তাদের নেই। প্রথমদিকে ক্যাডারবাহিনী চেষ্টা করেছিল যাতে পাশাপাশি বাস করা গরিব ও মাঝারি চাষি পরিবার মিলেজুলে চাষ করে। গ্রামে চাষের ব্যস্ত সময়ে গতর বা হালবলদ দেওয়া-নেওয়া করার রেওয়াজ একটা ছিলই। কিন্তু ক্যাডারবাহিনী পারস্পরিক সহযোগিতার ধারণাটাকে আরও খানিকটা বাড়িয়ে নিতে চাইল। এই চাপে চাষের সমস্যায় পীড়িত গ্রামবাসীরা পারস্পরিক সহযোগিতার রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য হল।

১৯৫৪ সালে নতুন পার্টি সম্পাদক ফেইহান একটা জটিলতর প্রকল্প সংগঠিত করল। কেবল একে অপরকে সাহায্য করাই নয়, এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীরা সারা বছরের জন্য তাদের ভূমিখণ্ডগুলিকে একত্র করে সেচ ও চাষ করল। তাতে যা ফসল আর মুনাফা এল, তার এক অংশ সদস্য-পরিবারেরা ভাগ করে নিল, বাকি অংশ ব্যবহৃত জমিতে আর পশুর পিছনে খরচ করা হল। এক-একটা পরিবারের আগের মতো ছোট্ট জমিতে বন্যা অথবা কীটপতঙ্গের উপদ্রবে মার খেয়ে শেষ হওয়ার ভয় রইল না। সমবায় আরও বেশি নিরাপত্তার আশ্বাস দিল।

এতে গরিব আর অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারেরা উৎসাহিত হল। ফেইহানের নতুন উদ্যোগে প্রথমে এসেছিল সবচেয়ে গরিবেরা। কিন্তু ক্রমেই সমবায়ের আয়তন বেড়ে উঠল। বড়োলোক যারা আসতে চাইল না, সমবায় তাদের সেচের কাজে সহযোগিতা করল না — এমনকী জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল, যাতে তারা চাপে পড়ে সমবায়ে যোগ দেয়। প্রথমে চেন গ্রামে দুটো সমবায় ছিল। কিন্তু এত বড়ো প্রকল্প সামলানোর অভিজ্ঞতা না থাকায় কিছুদিনের মধ্যে বেশ কিছু পরিবার আগের পারস্পরিক সহযোগিতার বোঝাপড়ায় ফিরে এল।

১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি মাও সেতুঙের নেতৃত্বে পার্টি 'অগ্রবর্তী' সমবায় গড়ার জাতীয় কর্মসূচি ঘোষণা করল। নতুন কর্মসূচিতে প্রত্যেক পরিবারের দেওয়া শ্রমকেই শুধু হিসেবের মধ্যে ধরা হল, জমি অথবা পশুর ব্যবহারের জন্য বার্ষিক খেসারত দেওয়ার ব্যবস্থা রইল না। এতে চেন গাঁয়ের দরিদ্রতর পরিবারগুলো ফের উৎসাহিত হয়ে উঠল।

মস্ত লাফে এগিয়ে যাওয়া

চাষিরা নতুন ব্যবস্থায় মানিয়ে ওঠার আগেই আরও বৈপ্লবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে এল পার্টির ওপরমহল থেকে। বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগগুলোকে জুড়ে ফেলে 'গণকমিউন' গড়ার নির্দেশ এল। চাষিদের আলাদা খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে যাতে সময় নষ্ট না হয়, তাই তৈরি করা হল গণ রান্নাঘর। এখানে চাষিরা যত খুশি খেতে পারত। এতে যে সময় বাঁচল, সেই সময়ের পরিশ্রমটা বড়ো বড়ো সেচ প্রকল্প, বড়ো খেত এবং গ্রামীণ শিল্প-উৎপাদনে ব্যয় করার পরিকল্পনা করা হল। জাতীয় নেতারা আশ্বাস দিলেন, এইভাবে লম্বা কদমে এগোলে চীন দ্রুতই প্রাচুর্য এবং প্রকৃত সাম্যবাদে প্রবেশ করবে।

চেন গ্রামের মানুষ আনন্দে সকলে মিলে একসাথে হাত মিলিয়ে কাজ শুরু করল। তারা দল বেঁধে এক জায়গা থেকে অন্যত্র কাজে যেত, যা জুটত একসঙ্গে খেত। একসঙ্গে মুফত যত খুশি খেতে পারাকে তারা সাম্যবাদ বলে মনে করল। প্রায় বিশ হাজার মানুষের একটা স্থানীয় বাজার–কেন্দ্রিক জেলাকে 'গণকমিউন' হিসেবে চিহ্নিত করা হল। পার্টির ক্যাডাররা বাজার–শহরের সদর দপ্তরে বসে একের পর এক নির্দেশ পাঠাত। একজন চেন সেদিনের স্মৃতিচারণ করে বলেন : 'ওরা বীজ বপনের একটা বন্দোবস্ত করল, নাম দেওয়া হল "আকাশ ভরা তারা"। সেখানে একটা খেতে এত গাদাগাদি বীজ বোনা হল, চারাগুলো ঠাসাঠাসি গজিয়ে উঠে পুষ্টি পেল না ... চাষিরা জানত ব্যাপারটা অর্থহীন। কিন্তু সেখানে আপত্তি করার কোন উপায় ছিল না। কারণ নির্দেশ আসত অনেক ওপর থেকে। আর যদি আমাদের চেন গাঁয়ের কেউ কমিউনের সভায় প্রতিবাদ করত, তাকে সমালোচনার মুখে পড়তে হত — দক্ষিণপন্থী, বিপ্লব–বিরোধী ... চাষিদের বলা হল, তোমরা নিজেদের জলের পাত্রগুলো গুঁড়িয়ে খাদ তৈরি করো। চাষিরা বলেছিল, এটা ফালতু, পাত্রের মাটি তো বন্ধ্যা। তাসত্ত্বেও পাত্রগুলো গুঁড়িয়ে ফেলতে হল। কী অব্যবস্থা! রাতভর ধান কেটে জমিতে ফেলে রাখা হল, তাতে ছাতা পড়ে গেল আর সেইসময় পরিশ্রান্ত গ্রামবাসীদের অন্য কাজে পাঠানো হল। এই সময়টাকে বলা হত, "পেট পুরে যত খুশি খাওয়ার সময়", কারণ লোকে সারা দিনে পাঁচ–ছ'বার করে খেত — কিন্তু সেবছর ফসল তেমন ফলল না। যা কিছু হল, যৌথ তহবিলে চলে গেল, চাষিদের ঘরে কিছু রইল না। কোন ফসল জমা হয়নি। খিদের চোটে লোকের ঘুম পর্যন্ত মাথায় উঠল ... কিছু লোক অসুখে পড়ল, কিছু বয়স্ক মানুষ মারা পড়ল। সারা গ্রাম চুপচাপ হয়ে গেল, যেন কেউ আর বেঁচে নেই।'

পরের মরসুমে গাঁয়ের মানুষ চাষ করল না। যে ফসলটুকু তারা ফলিয়েছিল, তার সিংহভাগ কমিউনের তদারকিতে চলে গেল যৌথ খাতে — আরও আটটা গ্রামের সঙ্গে ছিল চেন গ্রামের গণকমিউন। চেন চাষিদের আশঙ্কা, অন্য গ্রামের চাষিরাও এবার চাষ করতে চাইবে না। তাই অন্যদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশাও তারা করল না। ফলে সকলের জন্যই এল অনাহারের জ্বালা।

উৎপাদন থমকে গেল। এল দুর্ভিক্ষ। চাষিদের গড়ে ওঠা সংগঠন আর মনোবল চুরমার হয়ে গেল।

গণকমিউন ব্যবস্থায় বদল

তিনবছর টানা এই অবস্থা চলার পর সরকার 'মস্ত লাফে এগিয়ে যাওয়া'র ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করার উদ্যোগ নিল। নতুন সরকারি নীতি তৈরি হল। সেই অনুযায়ী চেন গ্রামকে একটা প্রোডাকশন ব্রিগেড ধরে নিয়ে পাঁচটা উৎপাদন দল গঠন করা হল। প্রত্যেকটা দলে রইল গোটা চল্লিশেক পাশাপাশি বাস করা পরিবার। গ্রামের এক–পঞ্চমাংশের ওপর সম্পত্তিগত অধিকার থাকল এই দলগুলোর। এবার ঠিক করা হল, যে দল যত ফসল ফলাবে, সেই ঘরগুলো তত বেশি খাবে। প্রত্যেকটা দল তাদের যৌথ শ্রমদানের অনুপাতে শস্য আর অর্থ পাবে। ব্যক্তিগত স্তরে প্রত্যেক পরিবার আগের মতো ছোটো জমি আর হস্তশিল্প রাখার অনুমতি পেল। এই পারিবারিক সম্পত্তি থেকে যে উৎপাদন হত, তা তারা পুনরায় চালু হওয়া গ্রামীণ বাজারে বিক্রি করত।

এবার এইসব উৎপাদন দলের পরিচালনায় এল নির্বাচিত নতুন কমিটি — সেখানে কে কতখানি 'লাল' তার চেয়ে বেশি কদর পেল পরিচালন দক্ষতা। আগের মতো বিশাল গণকমিউন তদারকি করার চেয়ে স্থানীয় উৎপাদন দলকে চালানো অনেক সহজ হল। এই নতুন ব্যবস্থাপনায় ফল পাওয়া গেল। ১৯৬১ সালের শেষে গ্রামের দুর্ভিক্ষের অবসান হল।

ভূমি সংস্কারের সময় গ্রামের দরিদ্রতম চাষি ছিল চেন কিংফা। সে এসেছিল পুরনো 'পদ্ম' শাখাভুক্ত জমিদার বংশ থেকে। কিংফার ঠাকুর্দার বাবা ক্যান্টনে ছোটোখাটো কর্মচারী ছিলেন। ঘুষের মোটা টাকা তাঁর হাতে এসেছিল। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি সেই টাকায় গাঁয়ের মস্ত জমিদার হয়ে গেলেন। কিংফার কাকাও ছিলেন জমিদার, তাঁর চমৎকার হস্তাক্ষর ছিল। কিন্তু ওর বাবা জুয়া খেলে আর নেশা করে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিংফার ছেলেবেলায় তার বাবার মৃত্যু হল। তারপর চলে গেল মা। কিংফাকে তখন ভিক্ষে করে খেতে হত। পরে এক বিধবা সন্তানহীন মহিলা ওকে আশ্রয় দেন। ছেলেবেলায় কিংফা কাকার পরিবারের গরু–ছাগল চরাতো। কমিউনিস্ট পার্টি যখন পাহাড়ে ঘাঁটি গাড়ল, কিংফা গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিল। মাস ছয়েক তাদের সঙ্গে থাকার পর পাহাড়ের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কাকার কাছে ফিরে এল। ভূমি সংস্কারের সময় কিংফা জমিদার কাকার অত্যাচারের বদলা নিল। সে কমিউনিস্ট ইউথ লিগে যোগদান করল। সেখানে তার উদ্যোগী ভূমিকা দেখে আর সমবায়ে তার লক্ষ্যণীয় কাজ দেখে ফেইহান তার নাম কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে সুপারিশ করল।

এই সময় পার্টি গ্রামে গ্রামে নতুন যুবক সদস্য চাইছিল। ইতিমধ্যেই চেন গ্রামের পার্টি সম্পাদক ফেইহান হয়ে পড়েছিল ক্লান্ত আর অলস। দুর্ভিক্ষের পর চেন গ্রামে নতুন করে উৎপাদনকে চাঙ্গা করে তোলার কাজে কিংফা দারুণ ভূমিকা নিল। প্রোডাকশন ব্রিগেডের প্রধান হিসেবে কাজ করে সে চেন গ্রামকে আশপাশের গ্রাম থেকে দ্রুত এগিয়ে নিল। ফেইহান ডেপুটি সেক্রেটারি পদে সরে গিয়ে কিংফাকে সেক্রেটারির পদ ছেড়ে দিল। চেন গ্রামের মাটি ছিল মিষ্টি আলু ফলনের জন্য উপযুক্ত। কিংফার উদ্যোগে উৎপাদন দলগুলো এই মিষ্টি আলু চাষে দারুণ সফল হল। অন্য গ্রামের চাষিরা তাদের মেয়েদের এই গ্রামে বিয়ে দিতে চাইল। কেননা তাহলে এই খারাপ সময়ে অন্তত বস্তা বস্তা আলু পাওয়া যাবে সম্বন্ধীর ঘর থেকে। বহু পুরুষ এই সুযোগে বিয়ে করে ফেলল। ১৯৬১ সালের সুসময়ে কিংফাও একজন ঘটক ঠিক করল নিজের পাত্রী খোঁজার জন্য। ঘটকরা যদিও পাকা মিথ্যেবাদী হত। কিন্তু এক্ষেত্রে ঘটক কিংফার জন্য ঘরের কাজে পাকা এক শক্তসমর্থ পাত্রী এনে দিল।

চেন গাঁয়ের অন্য পুরুষদের তুলনায় কিংফা ছিল একটু বেঁটে, কিন্তু যথেষ্ট গাঁট্টাগোট্টা, মাঠের কাজে প্রচণ্ড উদ্যমী। গ্রামে লোকে পুরুষদের বিচার করত দুটো বৈশিষ্ট্যে — কত দ্রুত একজন ফসল কাটতে পারে আর কত ভারি বোঝা ঘাড়ে ফেলে কত দ্রুত বয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই বিচারে চেন গাঁয়ে কিংফার স্থান ছিল তৃতীয় বা চতুর্থ। তবে অন্য নেতৃত্বদায়ী ক্যাডাররাও ছিল খুবই কর্মপটু। বাকপটুত্বের চেয়ে সেটার কদর ছিল বেশি। এছাড়া, লেখাপড়া না জানলেও কিংফার স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। বাজার–শহর বা জেলায় যখন সে কয়েকদিনের জন্য মিটিংয়ে যেত, ফিরে এসে চাষিদের কাছে সমস্ত বিষয় আর সিদ্ধান্তগুলো সঠিকভাবে গুছিয়ে বলতে পারত। একজনের স্মৃতিচারণে — 'যেসব লোক কথায় অনেক কিছুই দেয়, কিন্তু পালন করে না, তাদের মতো ও কেবল "মুখ" নাড়াত না। যখন কিংফা কিছু করার কথা বলত, পরের দিনই সবার আগে নিজে সেটা করত ... এব্যাপারে ওর কর্মপদ্ধতি ছিল ফৌজিদের মতো।'

তবে ওর মেজাজও ছিল তেমনই চড়া। দরকার মতো চূড়ান্ত মুহূর্তে সকলকে নিজের মতে এনে ফেলতে পারত। দেখতে দেখতে চেন গাঁয়ের অন্য ক্যাডাররাও অধস্তনদের এইভাবে বশে রাখার কায়দা রপ্ত করে ফেলেছিল। দোষ করলে বাচ্চাদের রাগ করে চড়িয়ে দিতেও পিছপা হত না

কিংফা। কারণ পার্টির সেক্রেটারির মুখের ওপর কারও বাপ-মাও কথা বলতে পারত না। তার বিরুদ্ধে গেলে চেন গাঁয়ে কোন পরিবারের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত।

পাহাড়ে ডাকাত থেকে গেরিলা হয়েছিল, এমন এক পুরনো দোস্তের সঙ্গেও কিংফা সম্পর্ক রেখেছিল। ঘুষ নেওয়ার অপরাধে তাকে পার্টির কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল; 'খারাপ লোক' তকমা দিয়ে তাকে ফেরত পাঠানো হল চেন গ্রামে। পার্টির বিচারে 'চার ধরনের খারাপ'-এর মধ্যে সে পড়ে গিয়েছিল। কিংফাকে সে অতীতে পাহাড়ের কমিউনিস্ট গেরিলাদের সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দিয়েছিল। সেই কৃতজ্ঞতায় কিংফা এই লোকটাকে প্রশ্রয় দিত।

গ্রামে যখন উৎপাদন দলগুলো গঠন করা হল, কিংফা তার পুরনো পদ্ম শাখাভুক্ত স্বজাতিদের পক্ষ নিল। এমনভাবে পরিবারগুলোকে পাঁচভাগ করা হল, যাতে চাষের জমিও সেইভাবে ভাগ হয়। কিংফা আপাতভাবে জমির উৎকর্ষতার দিকটা নজরে রেখে সমান সমান ভাগ করল। কিন্তু সুকৌশলে নিজের জ্ঞাতিগুষ্টির ভাগে একটু ভালো জমি দিল। একবছর বাদে সরকার নির্দেশ দিল, পাঁচটা দলকে দু'ভাগ করে দশটা দল কর। এতে আরও ছোটো দলে কাজ করতে সুবিধা হবে। এক-একটা দলে এবার কুড়ি-পঁচিশটা করে পরিবার পড়ল। এবারও কিংফা নিজের জ্ঞাতিদের সামান্য সুবিধা পাইয়ে দিল। যদিও দুবারই লটারি করে ভাগ হয়েছিল, কিন্তু তাতে কিংফা কারচুপি করেছিল।

বাজার-শহরকে ঘিরে ন'টা গ্রাম নিয়ে প্রশাসনিক জেলায় কমিউন রয়ে গিয়েছিল। 'মস্ত লাফে এগিয়ে যাওয়া'র পর্যায়ের মতো অতখানি ক্ষমতা কমিউনের হাতে ছিল না। বাজার-শহরের ছোটোখাটো দোকান আর স্থানীয় ছোটো শিল্পগুলো চালাত কমিউন। এছাড়া, বন্যা নিয়ন্ত্রণ আর সড়ক নির্মাণ প্রকল্পগুলোও তারা দেখাশুনা করত। বাজার-শহরে এই কমিউনের পার্টি কমিটির সদর দপ্তর ছিল। এই দপ্তরের মাধ্যমেই চেন গ্রামের সঙ্গে জাতীয় রাজনৈতিক কর্মসূচির যোগসূত্র রক্ষা হত। গ্রামের ভিতরের ব্যাপারে কমিউনের লোকেরা কচিৎ হস্তক্ষেপ করত। বরং তার চেয়ে আশপাশের গ্রামের উৎপাদন দল অথবা প্রোডাকশন ব্রিগেডের গুরুত্ব চেন গ্রামের চাষিদের কাছে বেশি ছিল।

ব্রিগেড পার্টি সেক্রেটারি হিসেবে কিংফা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কমিউন দপ্তরের কাছে দায়বদ্ধ ছিল। কে কতটা কর দেবে বা বীজ লাগাবে, শস্য বিক্রি করবে — এগুলোর কোটা ঠিক করে দিত কমিউন। এই কোটা পূরণ করার পর উৎপাদন দল স্বাধীন। সেই দলের নেতৃত্ব নিজেরাই মুনাফা বন্টন নিয়ন্ত্রণ করত। যদিও ব্রিগেড স্তরের প্রশাসনের হাতেও গ্রাম স্তরের সংস্থা কিছু ছিল; যেমন, কিছু হাঁস-মুরগি, একটা ছোটো ইটভাটা, একটা ফলের বাগান, পাহাড়ের ধারে লাগানো কিছু পাইন গাছ। কিংফা ও ব্রিগেডের ক্যাডারদের বেতনের জন্য উৎপাদন দলের ওপর সামান্য কিছু লেভি বসানো হয়েছিল। প্রতি বছর দলনেতাদের সঙ্গে ব্রিগেড-ক্যাডারদের মিটিংয়ে এর পরিমাণ স্থির করে নেওয়া হত। ব্রিগেড-প্রশাসনের আর্থিক সামর্থ তেমন না থাকায় কিংফা ব্রিগেডকে নিজের কবজায় ততটা আনতে পারেনি।

এই পরিস্থিতিতে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সে উৎপাদন দলগুলোর মধ্যে রাজনীতি শুরু করল।

ছেলেবেলায় কিংফার গলায় গলায় বন্ধু ছিল চেন লঙইয়ং। কিংফাই লঙইয়ংয়ের নামটা পার্টিতে সুপারিশ করে। 'মস্ত লাফে এগিয়ে যাওয়া'র সময় কিংফা যখন ব্রিগেডের নেতা নির্বাচিত হল, লঙইয়ং পেল গ্রামের যুবকদের 'শক ব্রিগেড'-এর দায়িত্ব। এরপর কিংফা হল পার্টির সেক্রেটারি আর লঙইয়ং পেল ব্রিগেডের প্রশাসনিক প্রধানের পদ। লঙইয়ং নিরক্ষর হলেও গায়ের জোরে ছিল গাঁয়ে একনম্বর। নেতাগিরি আর দাবিয়ে রাখার ক্ষমতাও তার কিংফার চেয়ে কিছু কম ছিল না। দুই বন্ধুর মধ্যে এবার রেষারেষি শুরু হল।

কিংফা গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে কিছু পেলে বিনা দ্বিধায় নিয়ে নিত। লঙইয়ং এসব পছন্দ করত না। কিংফা বিকেলের দিকে সময় পেলে নিজের জমিতে কাজ করত। লঙইয়ং তার পুরো উদ্যম আর সময়টা দিত গ্রামের কাজে। নিজের জমিতে নজর না দেওয়ায় তার পরিবারের তেমন ভালোমন্দ খাওয়া জুটত না। এছাড়া দলগত জমি বন্টনের ব্যাপারটাতেও দুজনের মধ্যে বিরোধ লেগেছিল। লঙইয়ং নিজে এসেছিল গরিব চাষিদের এক ছন্নছাড়া পরিবার থেকে। নিজের জ্ঞাতিগুষ্টির প্রতি কোন বিশেষ নেকনজর তার ছিল না।

আত্মশুদ্ধি : চার সংশোধন

সরকার ১৯৬৩ সালে 'চার সংশোধন' কর্মসূচি নিল। কিংফা এই মওকায় লঙইয়ংকে শায়েস্তা করার সুযোগ পেল। কিছুদিন আগে গাঁয়ের একটি সভাগৃহ তৈরি করার সময় কিছু তক্তা বেঁচে গিয়েছিল। লঙইয়ং কিংফাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ওই তক্তাগুলো সে তার নিজের রান্নাঘর তৈরি করার জন্য কিনতে পারে কিনা। কিংফা শুধু সম্মতই হয়নি, সে বিনা পয়সায় ওগুলো নিতে বলেছিল লঙইয়ংকে। এরপর ১৯৬৪ সালে চেন গ্রামের পার্টি শাখা সরকারিভাবে দুর্নীতি দমনের নির্দেশ পেল। কিংফা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে তক্তাগুলোর প্রসঙ্গটা এমনভাবে তুলল, যেন লঙইয়ং ওগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে। ব্রিগেডের সাধারণ সভায় লঙইয়ংকে নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে হল। সে ভেবেছিল, হয়তো এরকম ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, সামান্য কিছু জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু কিংফা ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টা বড়ো করে তুলল। সে বলল, 'ব্রিগেডের প্রধান নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে একথা ঠিক, কিন্তু কাজটা কি তার চেয়েও খারাপ মনে করেন আপনারা?' জনতার উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন তুলে দেওয়ায় সকলে একবাক্যে বলতে বাধ্য হল, 'হ্যাঁ ঠিক, আমরা তাই মনে করি।' কমিউনের সদর দপ্তরেও লঙইয়ংয়ের বিষয়টা ওইভাবে বিকৃত করে পেশ করা হল। কমিউন কমিটিও আরও জোর দিয়ে বিষয়টাকে আঁকড়ে ধরল। কিংফা নিজেও অতটা আশা করেনি। বোঝা গেল, পার্টি লঙইয়ংকে তাড়িয়ে দেবে। লঙইয়ং ক্ষমতা ভালোবাসত। সে চাইত তার কাজের জন্য গ্রামের লোক তাকে সম্মান করুক। এখন তার মুখ দেখানোর উপায় থাকল না। সে ঘরে ফিরে গলায় দড়ি দিতে গেল। তার বৌ দেখতে পেয়ে তাকে আটকাল। ক'দিন সেই আশঙ্কাত ওর বৌয়ের রাতে ঘুমানোর উপায় রইল না।

১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শীতকালে বাইরে থেকে তেরজন ক্যাডার গ্রামে এল। তারা বলল, 'চার বড়ো সংশোধন' কর্মসূচির জন্য তাদের এখানে পাঠানো হয়েছে। তারা কে কোথা থেকে এসেছে, এসব ব্যাপারে কিছু জানার অধিকার গ্রামের চাষিদের ছিল না। এই কর্মীদলের যুবকদের 'কমরেড' বলে ডাকতে হত। কিছুদিনের মধ্যে অবশ্য জানা গেল, কর্মীদলের প্রধান সহ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মধ্যবয়স্করা কমিউন অথবা জেলা স্তরের কর্মী। এরা ততটা শিক্ষিত নয়, কিন্তু পার্টির কাজ চালিয়ে নিতে পারে। আরও এক-তৃতীয়াংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অথবা শিক্ষিত শহুরে ক্যাডার — একজন মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক যুবতী। বাকি এক-তৃতীয়াংশ বছর কুড়ি বয়সের রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন চাষি।

প্রথমে এসে কর্মীদলের ক্যাডাররা চেষ্টা করল 'তিন একসাথে' অভ্যাস করতে — একসাথে থাকা, একসাথে খাওয়া আর একসাথে গরিব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাষিদের সঙ্গে কাজ করা। প্রত্যেককে কোন না কোন পরিবারে

নিজের কাজের আর থাকার জায়গা বেছে নিতে হল। এই চাষি পরিবারেরা নিজেদের ঘরে গাদাগাদি করে বাস করত। ফলে বাইরের কমরেডকে পরিত্যক্ত ছাউনির নিচে থাকতে দিতে হল। খাওয়ার জন্য সেই পরিবারকে পয়সা মিটিয়ে দিতে হত।

কিছুদিনের মধ্যেই কর্মীদল চেন গ্রামের সমস্ত চাষিকে সাধারণ সভায় ডাকল, কেবল চার ধরনের খারাপ লোকেদের বাদ দেওয়া হল। সভায় কর্মীদল কেন্দ্রীয় কমিটির 'চার বড়ো সংশোধন'–এর দলিল পড়ে শোনাল আর জোর দিয়ে বলা হল চেয়ারম্যান মাওয়ের উক্তিটা : 'শ্রেণীসংগ্রাম কখনও ভুলো না!' বলা হল : বিপ্লবের পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। জমিদার আর ধনী চাষিরা তাদের সম্পত্তি হারিয়েছে। অনেকে ধরে নিয়েছে শ্রেণীসংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু খারাপ লোকেরা চারপাশেই আছে। তাদের ভাবনাচিন্তার ধরন এখনও অন্যদের ওপর প্রভাব ফেলছে। তার প্রমাণ রয়েছে ক্যাডারদের আচার–ব্যবহারের মধ্যে। যদি চীনের ক্যাডাররা খারাপ দিকে চলে যায়, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র ভিতর থেকেই খতম হয়ে যাবে। ... তাই ক্যাডারদের সংশোধন করার জন্য এই কর্মসুচি নেওয়া হয়েছে। তাদের মাও সেতুঙের বিপ্লবী লাইন অনুসরণ করার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ...

চাষিরা সমস্তটাই শুনল, কিন্তু চুপ করে রইল। ক্যান্টন থেকে আগত এখন গ্রামের বাসিন্দা এক যুবক বলল, 'বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ এযাবৎ ভয় পেয়ে এসেছে। ক্যাডাররা হল রাজার মতো : ব্রিগেড–রাজা, দলের রাজা। যদি তুমি তাদের সম্পর্কে অভিযোগ কর, তারা হয়তো তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবে, সেটা খুবই ভয়াবহ হতে পারে। কারণ চাষিরা গ্রাম ছেড়ে যেতে পারবে না। একজন ক্যাডার প্রতিশোধ নিলে চাষিকে হয়তো বছরের পর বছর ভারি কাজ করতে হবে।'

কর্মীদল এটাই চাইছিল। ওপরতলা থেকে বলা হয়েছিল, নানান উপায়ে চাষিদের মুখ খোলাতে হবে। একজন ক্যাডার একটি পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের আস্থা অর্জন করতে পারল। তাদের কাছ থেকে গ্রামের কিছু তথ্য পাওয়া গেল। সেই সূত্র ধরে পড়শির ঘরে যাওয়া হল। এইভাবে এখানে ওখানে কিছু পেতে পেতে গাঁয়ের চিত্র অনেকটা স্পষ্ট হতে লাগল। কর্মীদল এইভাবে গ্রামের গরিব চাষিদের দৃষ্টিতে ক্ষমতা–সম্পর্কের একটা ধারণা পেল, বিভিন্ন গোষ্ঠী আর তাদের বিরোধগুলো জানল, দুর্নীতিগ্রস্ত ক্যাডারদের সম্পর্কে জানল।

চাষিদের কাছে আপন হওয়ার জন্য কর্মীদলের ক্যাডাররা খাটুনির কাজে নিজেদের আগ্রহ আর পারদর্শীতা দেখাতে চাইত। রোজ সকালের দিকে তারা নিজেদের মিটিং এবং অনুসন্ধানের কাজ করত, বিকেলে মাঠে চাষিদের সঙ্গে কাজ করত।

কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়মবিধি অনুযায়ী, ব্রিগেড ও উৎপাদন দলের ক্যাডারদের বছরে কমপক্ষে একশ কুড়ি দিন দৈহিক শ্রম করতে হত। সাধারণ চাষিদের মাপেই তাদের আয়ের হিসেব হত। বাড়তি ভাগ হিসেবে বড়ো জোর সমষ্টিগত আয়ের ওপর থেকে তারা ২% দাবি করতে পারত। কিন্তু সব ক্যাডার তো সমান ছিল না। কাজের সময় তারা কখনও কখনও মিটিং করত, অলস ক্যাডাররা ফাঁকিও মারত। একটা দূর পর্যন্ত ক্যাডার আর চাষি সকলেই মনে করত, ক্যাডার তার পদের জন্য কিছু সুবিধা তো পাবেই, না হলে কেউ ঝামেলা কাঁধে নিয়ে ক্যাডার হতে চাইবে কেন?

কর্মীদল আপ্রাণ চেষ্টা করছিল গ্রামে কর্মী (বা অ্যাকটিভিস্ট) খুঁজে বার করতে। অ্যাকটিভিস্ট নামে চীনে সরকারি কোন পদ ছিল না। কিন্তু সরকারের রাজনৈতিক প্রচার ও নীতি–নির্দেশগুলো কার্যকর করার জন্য তারা অনুগতভাবে সরকারি কর্মচারীদের সাহায্য করত এবং তারা একটা অ–আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা অর্জন করছিল। কর্মীদল সভায় সমালোচনা আর লড়াই করার জন্য তিন ধরনের নির্ভয় ভালোমানুষ পেল : বয়স্ক মানুষ যাদের সমাজে সুনাম রয়েছে; স্থানীয় যুবক, যাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং যারা স্থানীয় নেতাদের চটাতে ভয় পায় না; বিক্ষুব্ধ চাষি, যারা ক্ষমতার সঙ্গে মরীয়া লড়াই করতে রাজি।

ভূমি সংস্কারের সময় গ্রামে গরিব ও নিম্ন–মধ্য চাষিদের সমিতি তৈরি হয়েছিল। কর্মীদলের তত্ত্বাবধানে আবার তা নতুনভাবে গড়া হল। কর্মীদল চলে যাওয়ার পরেও ক্যাডারদের ক্ষমতা প্রয়োগের ওপর এদের নজরদারির দায়িত্ব পড়ল। কর্মীদলের প্রতি ওপরতলার পার্টির নির্দেশ ছিল, দশটি উৎপাদন দল থেকে একজন করে নিয়ে একজন সভাপতির নেতৃত্বে ১১ জনের ব্রিগেড স্তরের কমিটি মনোনীত করতে হবে; এরা সবাই আসবে গাঁয়ের গড় মানুষের থেকে খারাপ অবস্থার গরিব পরিবার থেকে। এরা সকলে ক্যাডারদের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতে প্রস্তুত ছিল। অবশ্য বিষয়টা দাঁড়িয়েছিল অন্যরকম, কর্মীদল যেসব পরিবারের সঙ্গে থাকত, কমিটি সদস্য বেশিরভাগ এল সেইসব পরিবার থেকে।

চেন গ্রামের গরিব চাষিদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সক্ষম ছিল, কমিউনিস্ট আমলে তাদের অবস্থা পাল্টে গিয়েছিল। তারা অনেকেই কিংফা বা লঙইয়ংয়ের মতো ব্রিগেড আর উৎপাদন দলের ক্যাডারের পদ পেয়েছিল। ফলে কর্মীদলের নতুন করে বাছাইয়ের সুযোগ তেমন ছিল না। যারা গরিব থেকে গিয়েছিল, তারা ছিল অযোগ্য অথবা শারীরিকভাবে গড় চাষিদের থেকে অক্ষম। দুজন গরিব চাষি প্রতিনিধি এল চেন কুলসমাজের বাইরে থেকে। এরা ১৯৪০–এর দশকে বাইরে থেকে এসেছিল এবং তারা গ্রামে কখনই সম্মান পায়নি। কিন্তু কর্মীদল দেখত, কে কতটা ক্যাডারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এরকম বাক্যবাগীশ আর সমালোচনায় মুখর প্রতিনিধিদের শীঘ্রই লোকে 'মুখে বিপ্লবী' বলে সম্বোধন করত।

সমিতির প্রতিনিধিত্বের ত্রুটি কাটিয়ে তোলার জন্য কর্মীদল এমন একজনকে ধরল, যিনি ষাটোর্ধ এক সম্মানিত গরিব চাষি। তিনি ছিলেন এক পুরনো বিপ্লবী, প্রথমদিকের পার্টি সদস্য; ভূমি সংস্কারের সময়কার চাষি সমিতির তিনি ছিলেন প্রধান। অন্যদিকে চেন কুলসমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের কাছাকাছি প্রজন্মের শেষ জীবিত সদস্য। তিনি যখন কাউকে সমালোচনা করতেন, মৃদু স্বরে কথা বলতেন আর কাউকে অপদস্থ করতেন না। তিনি কখনই কর্মবিমুখ ছিলেন না। কিন্তু বয়সের ভারে তাঁর কর্মক্ষমতা কমে এসেছিল। তাঁকে এবার গরিব ও নিম্ন–মধ্য চাষি সমিতির সভাপতি পদে মনোনীত করা হল।

তিন মাস ধরে কর্মীদল এইসব কাজ সারার পর কমিউনের সদর দপ্তরে তিন সপ্তাহ ব্যাপী অধিবেশন ডাকা হল। প্রথম সভায় সমস্ত ব্রিগেডের ক্যাডার, গরিব চাষি প্রতিনিধি এবং কর্মীদল সদস্য নিয়ে প্রায় এক হাজার মানুষ যোগ দিল। প্রথমে একটা ব্রিগেডকে পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র ধরে নিয়ে ক্যাডারদের সামনে তোলা হল আর সেই ব্রিগেডের গরিব চাষি প্রতিনিধিদের দিয়ে তাদের বেইজ্জত করা হল। কিন্তু যখন এক–একটা ব্রিগেড আলাদা আলাদা সভা শুরু করল, প্রত্যেক ব্রিগেডের গরিব চাষি প্রতিনিধিরা সেই গ্রামের ক্যাডারদের থেকে পৃথক হয়ে খাওয়া–শোওয়া চালাতে লাগল। দু'সপ্তাহ ধরে কর্মীদল চেষ্টা চালাল, অবশেষে অভিযোগগুলো লিখিতভাবে সামনে জড়ো করা হল। ভয়ে চেন গ্রামের কিংফার মতো ক্যাডাররা খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিল।

ক্যাডাররা সম্পূর্ণ অপদস্থ হয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় গ্রামে ফিরল। কমিউনের সভায় সামান্য কয়েকজনের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হয়েছে। কিন্তু এবার গোটা গাঁয়ের মুখোমুখি হল তারা। গ্রামের সভায় সবচেয়ে মারমুখী আর মুখর ছিল গ্রামরক্ষী বাহিনীর যুবকেরা। রাতের পর রাত গ্রামে এইসব

লড়াইয়ের মিটিং চলত। ক্যাডারদের মধ্যে ফেইহানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অধঃপতনের অভিযোগ আনা হল। সে ইতিমধ্যে বারোয়ারি খাদ্যদ্রব্য আত্মসাৎ করার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এছাড়া কমিউনের দপ্তরে মিটিংয়ে গিয়ে সে মহিলাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ত। তার এইসব আচরণ আর অলস প্রকৃতি গ্রামের সকলের কাছেই নিন্দনীয় ছিল। লঙইয়ংকে তার অতিরিক্ত নেতাগিরি আর খারাপ ব্যবহারের জন্য সমালোচনা করা হল। সবচাইতে সমালোচিত হল কিংফা, কারণ চেন গ্রামে সে হয়ে উঠেছিল 'স্থানীয় রাজা'।

কিংফার নিজের উৎপাদন দল (৬ নম্বর) থেকে এক যুবক চাষি সবচেয়ে মুখর হল সমালোচনায়। পদ্ম শাখা–বংশের এই দলের সদস্য–পরিবারেরা ছিল সামাজিকভাবে বেশ আঁটোসাটো। তাদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছিল কিংফার বিরুদ্ধে। এছাড়া ৩ ও ৪ নম্বর দল তাদের খারাপ জমি বন্টন করার দায়ে কিংফার দিকে আঙুল তুলল। কিংফা এতখানি বদমেজাজি ছিল, গরিব ও নিম্ন–মধ্য চাষিদের গায়ে হাত তুলতে পর্যন্ত দ্বিধা করত না। তাছাড়া নিজের জ্ঞাতিগুষ্টির প্রতি স্বজনপোষণ তো ছিলই। গ্রামে মাংস খাওয়া ছিল বিলাসিতা। অথচ কিংফা নিজের কর্তৃত্ব খাটিয়ে ব্রিগেডের ক্যাডার আর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মিটিংয়ের পর মুরগি বা হাঁসের মাংস খাওয়ার বন্দোবস্ত করত। ব্রিগেডের বাগানের ভালো ফলমূলও সে আত্মসাৎ করত। চাষিরা আড়ালে বিদ্রুপ করে এইসব ক্যাডারদের বলত, 'ভালো খাওয়াদাওয়া সমিতি'। এখন কর্মীদল এইসব অধঃপতনকে কাটাছেঁড়া করতে চাইল।

যখন চীন এবং হঙকঙের মধ্যে সীমান্তের কড়াকড়ি কমে গেল, কিংফা ১৯৬২ সালে গ্রামের এক ধনী চাষি পরিবারকে হঙকঙে যাওয়ার ভিসার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। প্রতিদানে সেই পরিবার তাকে একটা সোনার চেন আর দুটো কানের দুল উপহার দিয়েছিল। এই ধরনের উপহার নেওয়াকে সর্বহারার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য করা হল। এখন বলা হল, কিংফা তার শ্রেণীশত্রুদের সঙ্গে মাখামাখি করছে আর গরিব ও নিম্ন–মধ্য চাষি শ্রেণীবন্ধুদের ওপর পীড়ন করছে।

এরপর কর্মীদল উৎপাদন দলের নেতা নির্বাচন ঘোষণা করল। চাষিয়া নিজেদের 'ভাতের পাত্র'–এর কথা মাথায় রেখে এই নির্বাচনকে খুবই গুরুত্ব দিল। প্রত্যেক উৎপাদন দলের ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে থাকত একজন দলপতি, দুজন সহকারী দলপতি, একজন হিসেব–রক্ষক, একজন হিসেব–পরীক্ষক, একজন গুদামরক্ষী এবং একজন মহিলা প্রতিনিধি। দশটি দলের মধ্যে ছ'টিতে পুরনো দলপতিরা পুনর্নির্বাচিত হল। এই ছ'টি ছিল গ্রামের পশ্চিম ও মধ্য এলাকার, যেখানে সন্তোষজনক উৎপাদন হয়েছিল। গ্রামের মতামতের ধারা বুঝে নিয়ে কিংফাকে অস্থায়ীভাবে ফের পার্টি শাখার সেক্রেটারি করা হল। লঙইয়ং এবং অন্য ব্রিগেড ক্যাডাররাও পুনর্নির্বাচিত হল। কেবল ফেইহানকে ডেপুটি পার্টি সেক্রেটারির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। সেক্রেটারি ও ডেপুটি সেক্রেটারির পদে নির্বাচন হত না, কমিউন পার্টি কমিটি সাধারণত এদের ওপর থেকে মনোনীত করত। পার্টি শাখার ব্রিগেড কমিটিকে গোপন ব্যালটে নির্বাচিত করেছিল চেন গ্রামের ত্রিশজন পার্টি সদস্য। পার্টি শাখা কমিটি, যার হাতে ব্রিগেডের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল, তারাই ব্রিগেড ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের মনোনীত করত। অতএব সাধারণ চাষিদের ব্রিগেড স্তরের পরিচালক (ম্যানেজমেন্ট) নির্বাচনে সরাসরি মতদানের অধিকার ছিল না।

তবে কর্মীদল প্রত্যেক মিটিংয়ে গরিব ও নিম্ন–মধ্য চাষিদের শ্রেণী হিসেবে সহজাত বিপ্লবী বলে গুণগান করত। এছাড়া, তারা গ্রামে পার্টির নতুন সদস্যও তৈরি করেছিল। বাছাই চাষিদের পার্টি সদস্য হিসেবে আবেদন করানোর দায়িত্ব ছিল পার্টির গ্রাম শাখার। এই আবেদনগুলো পর্যালোচনা করত কমিউন পার্টি কমিটি। যদি তা বিবেচিত হত, তাহলে একবছর সেই প্রার্থীদের পরীক্ষাধীন পর্বে থাকতে হত। সেই পর্বে তারা পার্টির মিটিংয়ে উপস্থিত থাকত, কিন্তু ভোট দিতে পারত না। সাতজনকে পরীক্ষাধীন প্রার্থী করা হল। এরা ছিল সেইসব ঘরের যেখানে কর্মীদলের ক্যাডাররা থাকত।

মাও চিন্তাধারার অধ্যয়ন

১৯৬৫ সালের শেষদিকে কর্মীদলের কাছে নির্দেশ এল, চাষিদের মাও চিন্তাধারা অধ্যয়ন করাতে হবে। ১৯৬৫–৬৬ সালের শীতকালে প্রত্যেক উৎপাদন দল থেকে একজন করে নিয়ে দশজনকে জেলা–দপ্তরে দশদিনের প্রশিক্ষণে পাঠানো হল। মাওয়ের তিনটি লেখা পাঠে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হল : ১. জনগণের সেবা কর; ২. নরম্যান বেথুন স্মরণে; এবং ৩. যে বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিল। যেসব যুবক চাষি এগুলো পড়ে উদ্বুদ্ধ হল, তাদের বলা হল গ্রামে ফিরে গিয়ে সেই শিক্ষার প্রয়োগ ঘটাতে। এরপর গ্রামে পাঁচদিনের একটানা শিবির করা হল। সেখানে চার ধরনের খারাপ চাষিদের বাদ দিয়ে (তাদের জন্যও আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল) সমস্ত সক্ষম চাষিদের ডাকা হল। পাঁচটা দলে ভাগ করে এক–একটাতে নবীন–প্রবীণ, নারী–পুরুষ, অগ্রণী–পশ্চাদপদ মিলিয়ে মিশিয়ে ভারসাম্য রেখে একশজনের দল তৈরি করা হল। চাষিদের কাছে পাঁচদিন মাঠে কাজে না গিয়ে ভাষণ শোনার অভিজ্ঞতাই ছিল অন্যরকম। এরপর সকালে–বিকেলে সবাই মিলে বিপ্লবী গান গাওয়া শুরু হল। তালিম পেয়ে চাষিরা গাইতে শিখে নিল — 'বিপ্লবের জন্য জমি চাষ করি', 'জনগণের সেবা কর', 'পূর্বদিগন্ত লাল' ইত্যাদি। এবার এল গ্রামে সিনেমা। সেই ছবিতে মাওয়ের প্রতীক হিসেবে যখন পর্দার ওপর লাল সূর্য ভেসে উঠত, চেন গ্রামের চাষিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উল্লাসে ফেটে পড়ত।

১৯৬৬ সালে চেন গ্রামে বিদ্যুৎ এল। গ্রামের মধ্যে ত্রিশটা চোঙ খাটানো হল তার দিয়ে, একটা বড়ো চোঙ বসল গ্রামের মূল সভাস্থলে। সেই চোঙে ব্রিগেড বেতার–বার্তা ঘোষণা করত। আও বলে শহর থেকে আসা একটি মেয়েকে কর্মীদল ব্রিগেড–ঘোষকের নতুন পদে মনোনীত করল। সতেরো বছরের রোগা পাতলা চেহারার মেয়েটি ছিল খুবই কর্মিষ্ঠ আর একনিষ্ঠ মাও চিন্তাধারা প্রচারক। সেইসময় গ্রামে মাত্র দুজনের ঘড়ি ছিল। সকালে আও মাইকে ঘোষণা করত : 'কমিউন সদস্যগণ, কমরেড, খেয়াল করুন এখন সকাল সাড়ে সাতটা। আশা করি আপনারা সকলে যত তাড়াতাড়ি পারবেন আপনাদের উৎপাদন দলের দপ্তরে পড়তে চলে যাবেন।' মাঠে যাওয়ার আগে মাওয়ের পবিত্র চিন্তাকে সম্মান দিতে চাষিরা অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য মাওয়ের উদ্ধৃতি পাঠ করে যেত। ঋতু অনুযায়ী আও পাঠের সময়টা বদলে দিত। হালকা কাজের সময় সকাল সাড়ে ছ'টা আর গরমের ব্যস্ত সময়ে ভোর সাড়ে চারটেয় ঘোষণা হত। প্রথমে মেয়েদের জন্য ঘোষণা হত, যাতে তারা বিছানা ছেড়ে উঠে শুয়োরগুলোকে খাইয়ে সকালে ঘরের নাস্তা তৈরি করে ফেলতে পারত। তাদের স্বামীরা উঠত পরে। টানা দু'ঘন্টা পর্যন্ত ঘোষণা চলত, যতক্ষণ না পর্যন্ত সকলে পড়ার জায়গায় জড়ো হয়ে যেত। পড়ন্ত বিকেলে ঘরে ফেরার পর আবার দু'ঘন্টা ঘোষণা হত। ঘোষণার মাঝে অর্ধেক সময় প্রাদেশিক রেডিও স্টেশন থেকে গানবাজনা আর রিপোর্ট শোনানো হত। কমিউনের দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকত। এছাড়া, বাকি অর্ধেক সময় ব্রিগেডের খবর আর আলাপ–আলোচনা শোনানো হত। আও মনে করত, এই বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যকরভাবে আদর্শগত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। গ্রামে বিভিন্ন কাজের জায়গায় সাইকেলে ঘুরে ঘুরে সে খবর সংগ্রহ করত।

মাও সেতুঙের ওপর বিশ্বাস এমন জায়গায় পৌঁছাল, একজন স্মৃতিচারণ

করেন : 'আগে জমিদারেরা আমাদের শোষণ করত। খাবার মতো কিছু ছিল না। জীবন ছিল কঠিন। ভগবান কি আমাদের সেইসময় রক্ষা করেছে? কিন্তু যখন পার্টি এল, চেয়ারম্যান মাও এলেন, আমরা খাবারদাবার পেলাম, জামাকাপড় পেলাম, জীবনটাই উন্নত হল। তাই ভগবানে আমাদের বিশ্বাস করার দরকার নেই। আমরা চেয়ারম্যান মাওয়ের ওপর বিশ্বাস রাখি!'

গাঁয়ে এতদিন ধরে চলে আসছিল নানা কুসংস্কার, নানা গ্রাম্য প্রথা আর আচার-অনুষ্ঠান। 'চার বড়ো সংশোধন'-এর মধ্যে শেষ কর্মসূচি ছিল অন্ধ কুসংস্কার বিরোধিতা। এব্যাপারে কর্মীদলের নেতৃত্বে এক সভায় চেন গ্রামের যারা পেশাদার গণৎকার আর ওঝা ছিল, তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ মঞ্চে উঠে তাদের তুকতাক নিয়ে স্বীকারোক্তি করল। কিছু সক্রিয় মহিলা মঞ্চে উঠে তাদের হাতের চুড়ি ভেঙে ফেলল আর প্রকাশ্যে ঘোষণা করল : 'আমাকে কুসংস্কার ভেঙে ফেলতে হবে।'

কমিউনের দপ্তরে তখন এক চিকিৎসক-কর্মীকে বসানো হয়েছিল। চেন গ্রাম থেকে এক চাষি ভয়ানক ব্যথায় কাতর হয়ে তার কাছে গেল। চিকিৎসক তার পেট থেকে একটা বড়ো ফোঁড়া কেটে বার করে দিল। গ্রামের লোক এতে অবাক হয়ে গেল। কর্মীদলের পরামর্শে চেন গ্রাম থেকে খরচ দিয়ে দুজন যুবককে জেলা দপ্তরে পাঠানো হল নতুন গ্রামীণ চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নিতে — একজন পশ্চিমি চিকিৎসায়, অপরজন চীনা চিকিৎসায়।

তাচাই থেকে শেখো

গত কয়েক বছর ধরে চাষিরা খাটত 'পিস রেট' পদ্ধতিতে — কাজ অনুযায়ী ওয়ার্ক-পয়েন্টের ভিত্তিতে। এতে পরিমাণগত দিকটার ওপর জোর পড়ত, কাজের মানের ওপর জোর পড়ত না। তাচাইয়ের চাষিরা পাহাড়ী অনুর্বর ক্ষেত্রে সমবেতভাবে স্বনির্ভরতার ওপর জোর দিয়ে কঠিন পরিশ্রম করে উৎপাদনে ভালো ফল পেয়েছিল। এতে কাজের সামগ্রিক মানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পরিমাণের ওপর নয়। এছাড়া পিস রেট পদ্ধতিতে মেয়েরা যেসব কাজ করত, যেমন বীজ বোনায় কম পরিশ্রম আর দক্ষতা লাগে মনে করে কম ওয়ার্ক-পয়েন্ট ধরা হত; মূল্য বিচারে পুরুষদের কাজগুলো অগ্রাধিকার পেত।

চেন গ্রামের খেতগুলোয় বড়ো বড়ো গর্ত ছিল, কোন কোনটা ছ'ফুট পর্যন্ত গভীর। কর্মীদল বলল, এগুলো ভরাতে হবে। পাহাড় থেকে বাঁকে মাটি বয়ে এনে গর্ত ভরতে হল। যেখানে মাটিতে বালির ভাগ বেশি ছিল, সেখানে মাটি পাল্টাতে হল যাতে চারাগুলো একইভাবে জল পায়। আগে উৎপাদন দলগুলোর মধ্যে ব্যক্তি বা পারিবারিক স্বার্থের রেষারেষি ছিল। এখন সমস্ত কাজটা কর্মীদলের কর্তৃত্বে এল। আগে ধান রোয়ার পর ফসল তোলার আগে পর্যন্ত কাজ কিছুটা হালকা গতিতে চলত। এখন পাহাড়ের লাগোয়া জমি পরিষ্কার করে লিচু, মটর, বাঁশ গাছ লাগানো হল। বিদ্যুতের সংযোগ হয়ে যাওয়ায় গ্রামে সেচের জন্য জলের পাম্প লাগানো হল। পাহাড়ের নিচে নতুন অর্থকরী ও অধিক ফলনশীল শস্য লাগানো হল। কর্মীদলের একগুঁয়েমিতে চেন গ্রাম সবুজ বিপ্লবে যোগ দিল। এর ফলে সারের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেল। ছোটোখাটো কৃষি যন্ত্রপাতি আসতে শুরু করল গ্রামে।

১৯৬৬ সালের মে মাসে একদিন এক নরম মেজাজের চাষির হাঁস ঢুকে গেল কিংফার দাওয়ায়। ওই চাষি ছিল তিন নম্বর উৎপাদন দলের সদস্য। কিংফা হাঁসটা হাতিয়ে নিতে চাইল। সেই চাষি তার দলের দায়িত্বে থাকা কর্মীদলের সদস্যের কাছে কিংফার নামে অভিযোগ করল। এই কর্মীটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এক যুবতী। ব্রিগেডের পরবর্তী মিটিংয়ে সে সরাসরি কঠোরভাবে কিংফাকে আক্রমণ করল। কিংফা তার পুরনো কায়দায় মেজাজ দেখাতে শুরু করল। মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'যখন আমি এখানে বিপ্লব করছিলাম, তোমাদের তো পাত্তাই ছিল না!' মেয়েটি অত লোকের সামনে কেঁদে ফেলল। চেন গ্রামের কর্মীদল বিষয়টা কমিউনের সদর দপ্তরে রিপোর্ট করল। কিংফাকে সেক্রেটারির পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে পরীক্ষামূলক পার্টি সদস্যের পদে রাখা হল। তার জায়গায় সেক্রেটারি করা হল কমিউনিস্ট ইউথ লিগের সেক্রেটারি বছর পঁচিশেক বয়সের চেন জিনঈ-কে। জিনঈ নিজে চাষ করত না, জমি সে ভাড়া খাটাত। সে কিন্তু পার্টির কাজে কিংফার মতো দক্ষ ছিল না — কমিউন-দপ্তরের মিটিং থেকে গ্রামে ফিরে গুছিয়ে রিপোর্ট করতে পারত না।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

শহর থেকে যে পঞ্চাশজন যুবক ১৯৬৪ সালে গ্রামে এসেছিল, প্রথমে তারা চাষিদের উৎপাদন দলে যোগ দেয়নি। তাদের নিজস্ব 'যুব দল' ছিল। গ্রামে প্রাথমিক বসবাসের জন্য সরকার তাদের কিছু অর্থ দিয়েছিল। প্রথমে গ্রামের পুরনো মন্দিরের সংস্কার করে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তাদের জন্য একটা খাবার ঘরও গড়া হয়েছিল। গ্রামের দশটি উৎপাদন দল প্রত্যেকে এক একর করে জমি দিয়ে এদের জন্য সমষ্টিগতভাবে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করেছিল। এদের মধ্যে ছিল সাতজন কমিউনিস্ট ইউথ লিগ সদস্য। তারা এখানে ইউথ লিগের একটা শাখা খুলেছিল এবং যুব দলের নেতৃত্ব দিত তারাই। এরা দেশের জন্য কাজ করতে এসেছিল স্বেচ্ছায়, প্রত্যেকেই বিপ্লবী হিসেবে এগিয়ে যেতে চাইত। এই এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা থেকে বাস্তবে একটা প্রতিযোগিতা হত ক্যাডারদের মধ্যে। চাষিরা চাইত এই যুবকেরা একটু ভালো খাওয়াদাওয়া করুক। কিন্তু এই বহিরাগত কর্মীরা চেষ্টা করত গরিব ও নিম্ন-মধ্য চাষিদের মতো জীবনযাপন করতে। শহর থেকে আসার এগারো মাস পরে যুব দল তুলে দেওয়া হল। পাঁচজন করে যুবককে এক-একটা উৎপাদন দলে যুক্ত করে দেওয়া হল।

ইউথ লিগের সদস্যরা ছিল এই বহিরাগতদের নেতা। চেন গ্রামে দু'বছর কাটানোর পর মাত্র তিনজন যুবককে লিগের নতুন সদস্যপদ দেওয়া হল। এই লিগ-সদস্যদের মধ্যে তিনজন হয়ে উঠল সবচেয়ে সামনের সারির — যুবতী আও, যুবক স্টকি ওয়াঙ এবং রেড চেঙ। স্টকি ওয়াঙের বাবা বিপ্লবের ঠিক আগে মারা গিয়েছিলেন। ওর মা আবার বিয়ে করেন। ওর সৎ-বাবা গৃহযুদ্ধ এবং কোরিয়ার যুদ্ধে অংশ নেন। তাঁকে বীরযোদ্ধার সম্মান দেওয়া হয়েছিল। সেই পরিচয়েই ওয়াঙ ভালো-শ্রেণীর মর্যাদা পেয়েছিল। জুনিয়র হাইস্কুল ছাড়ার পর সে গ্রামে কাজ করতে আসে। আদর্শের চেয়েও তার ভালো লাগত যুবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার উত্তেজনা। রেড চেঙের বাবা ছিলেন এক আদর্শ শ্রমিক। ওর বড়দা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। রেড চেঙ জুনিয়র হাইস্কুলে ভালো ছাত্র ছিল না। একটা তুচ্ছ চুরির ঘটনায় সে ধরা পড়েছিল। ওর দাদা ভয়ানক ভর্ৎসনা করেছিল। সে তখন গ্রামে যাবে ঠিক করে।

এই তিনজন নেতা অন্যদের কাছে ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠল। নেতাদের ওপর বিক্ষুব্ধদের একজন, নাম তার লি, ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে ক্যান্টনে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা শোনা যাচ্ছিল। লি শুনতে পেল, জাতীয় সংবাদপত্রে পিকিংয়ের শিক্ষিত মহলে 'বিষাক্ত আগাছা' নিয়ে চর্চা হচ্ছে। পিকিং মিউনিসিপাল পার্টি কমিটিকে আক্রমণ করা হচ্ছে; 'বুর্জোয়া' পণ্ডিতদের আক্রমণ করা হচ্ছে। গ্রীষ্মকালে চেন গ্রামে খবর এল, ক্যান্টনে খারাপ-শ্রেণীর শিক্ষকদের ছাত্ররা আক্রমণ করেছে। লি সাইকেল চালিয়ে নিজের পুরনো স্কুলে গেল। দেখতে পেল, ভালো-শ্রেণীর ছাত্ররা সেখানে ছাত্রদের একত্রিত করে অধ্যক্ষকে আক্রমণ করেছে। দুর্ভাগা অধ্যক্ষের দোষ হল, তিনি তাঁর খারাপ-শ্রেণী থেকে আসা মাকে দেখাশুনা করেছিলেন। লি নিজে লাল-শ্রেণীর না হলেও পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে এ নিয়ে

আলাপ করল। ছাত্রদের পোস্টারগুলোও তার নজরে পড়ল। সে তড়িঘড়ি চেন গ্রামে ফিরে এসে বিক্ষুব্ধ অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করল — 'আমাদের বোঝাপড়ায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব এমন এক আন্দোলন হওয়া উচিত, যা নিচ থেকে ওপরে যাবে, ওপর থেকে নিচে নয়। আর তা আধা-খ্যাঁচড়া নয়, যেভাবে কমিউন এটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে ...'। এতে উৎসাহিত হয়ে উঠল গাও নামে পুঁজিবাদী ঘর থেকে আসা আর এক বিক্ষুব্ধ যুবক। গাও আর লি দুজনে মিলে বাজার-শহরের কাছে কমিউনের সদর দপ্তরের সামনে একটা দেওয়াল-পোস্টার লাগিয়ে দিল। পোস্টারের নিচে তারা লিখেছিল : 'মাওবাদী রেডগার্ড'। এই দুঃসাহসী কাজ করতে তারা ভয় পেল না। কারণ তারা শুনেছিল, মাও বলেছেন — 'তোমরা কি দেশের নানা বিষয়ে উদ্বিগ্ন? তোমরা কি মহান প্রলেতারিয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবে অংশ নিয়েছ?' সেইসময় ওখানে ব্রিগেডের ক্যাডার, কর্মীদল এবং মাও চিন্তাধারার প্রচারকদের মিটিং চলছিল।

যখন অন্য ব্রিগেডের ক্যাডাররা সদর দপ্তর থেকে চলে গেল, চেন গ্রামের ক্যাডাররা ওখানে থেকে গেল। কমিউনের কর্মীদল-নেতৃত্ব ওদের বলল, তোমরা এখানে থেকে পোস্টার যারা দিয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলো। ওরা লিকে বাচ্চা মনে করত, ভেবেছিল দলে ভিড়ে এসব করেছে বটে, তবে সে প্রতিবিপ্লবী নয়। অতএব ওকে পুনর্শিক্ষিত করে তোলা যাবে। কমিউনের জননিরাপত্তা প্রধান লি আর গাওকে নিয়ে ব্রিগেডের এলেন। একপাশে ডেকে লিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন তুমি বিগ-ক্যারেকটার পোস্টার লিখেছ? কে তোমাকে নির্দেশ দিয়েছে?' লি বলল, 'কেউ তো বলেনি। আমি নিজের থেকেই লিখেছি। ... আপনি যদি মনে করেন, এটা আলাদা কিছু, আপনি অন্যত্র যান। ক্যান্টনে গেলেই বুঝতে পারবেন কী হচ্ছে।' তিনি বললেন, 'আমি তো তোমরা ভুল করেছ বলিনি। আমি শুধু জানতে চাইছি, কে তোমাদের এসব করতে বলেছে?'

বিদ্রোহী যুবকদের সঙ্গে ব্রিগেডের ক্যাডার এবং কর্মীদলের বিরোধ বেড়ে গেল। সমস্ত যুবকদের মিটিংয়ে ডাকা হল। সেখানে বিদ্রোহীরা নেতাদের বলল, 'তোমরা আমাদের দমন করছ। জনগণকে নিজের সাংস্কৃতিক বিপ্লব করতে দিতে হবে।' নেতারা বলল, 'তোমরা কিছু জানো না।' বিদ্রোহীরা জবাব দিল, 'তোমরা কী জানো? ...'

গ্রামের চাষিরা ব্যাপারটা ধরতে পারল না। বিদ্রোহীরা চাষিদের কাছ থেকে কোন সহানুভূতি পেল না। তারা গুয়াঙদঙ প্রদেশের পার্টি সেক্রেটারির কাছে লিখল, চেন গ্রামে কীভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ হবে? জবাব একটা এল বটে, কিন্তু কোন নির্দেশই তাতে ছিল না।

গ্রামের লোক এসব জানতে পেরে বহিরাগত যুবকদের সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে উঠল। কর্মীদলের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে স্টকি ওয়াঙকে গাওয়ের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে বলা হল। ওয়াঙ গাওকে আলাদা ডেকে সতর্ক করে দিল। গাওয়ের বাবা ১৯৫০-এর দশকে প্রতিবিপ্লবী হিসেবে কাজ করে অভিযুক্ত হয়েছিল — একথা ওকে মনে করিয়ে দেওয়া হল। গাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাওবাদী রেডগার্ড থেকে সরে গেল।

বিদ্রোহীদের মধ্যে নেতা হয়ে উঠল দেঙ নামে আর এক যুবক। ওর বাবা-মা ছিল স্বচ্ছল, তারা ইন্দোনেশিয়ায় থাকত। ছোটোবেলায় দেঙকে ক্যান্টনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় লেখাপড়ার জন্য। হাইস্কুলের পড়া ছেড়ে গ্রামে চলে এলেও সে ইলেকট্রিকের কাজ জানত। যথেষ্ট উদ্যমী হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিসেবে তার কোনও স্থান ছিল না।

গাও এবং লি পোস্টার দেওয়ার সপ্তাহ দুয়েক পরে পার্টির ওপরতলা থেকে নির্দেশ এল, যুবকদের মধ্যে যাদের নিখুঁত 'লাল' শ্রেণীভিত্তি রয়েছে, তাদের নিয়ে রেডগার্ড ইউনিট গড়তে হবে। স্টকি ওয়াঙ এবং রেড চেঙের নেতৃত্বে গ্রামে 'মাও চিন্তাধারা রেডগার্ড' গঠন করা হল। চেন গ্রামের নিজস্ব সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে এই নতুন সংগঠনের মিটিংয়ে গাওদের 'মাওবাদী রেডগার্ড' বাতিল করা হল। একই সঙ্গে উঠিয়ে দেওয়া হল গ্রামের কমিউনিস্ট ইউথ লিগের শাখা; নতুন সংগঠনকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হল। নতুন সংগঠন কমিউন-স্তরের কর্মীদলের নির্দোষ অনুযায়ী এক নতুন কর্মসূচি নিল — চার পুরনোকে ধ্বংস করো; মাও চিন্তাধারা রেডগার্ড সমস্ত মেয়েদের লম্বা বিনুনি কেটে ফেলার নির্দেশ দিল; তারা সমস্ত চাষি পরিবারকে তাদের বংশ-লতিকা খোদাই করা পাথরের ফলক বাড়ির বাইরে বার করে ভেঙে ফেলতে বলল; ঘরের বৌরা সৌভাগ্যের প্রতীক স্বরূপ পিঠে বানানোর যে ছাঁচগুলো ব্যবহার করে এসেছে এতদিন, সেগুলো ভেঙে ফেলল; বাড়িতে রয়ে যাওয়া পুরনো 'সামন্ততান্ত্রিক' পুঁথিপত্র খুঁজে বার করে পুড়িয়ে ফেলা হল। এছাড়া, হঠাৎ করে একদিন গ্রামে জরুরি সাইরেন বাজিয়ে রাতের বেলায় খারাপ-শ্রেণীর অর্থাৎ পুরনো জমিদারদের বাড়ির আসবাব, কাপড়-চোপড়, অর্থ, গয়নাগাটি পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা হল। এর মধ্যে পুরনো এক জমিদারের বাড়িতে ছিল তাঙ রাজত্বের এক কবির কবিতা, সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা, তাতে ছিল চীনা চাষির কঠিন জীবন সম্পর্কে এক অনুতপ্ত বর্ণনা।

মাওবাদী রেডগার্ডরা কর্মীদল সম্পর্কে অভিযোগ করেছিল, পুঁজিবাদের পথিকদের ব্যাপারে তারা যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না। মাও চিন্তাধারা রেডগার্ডরা দেখাতে চাইল, তারা কতটা মাও অনুরাগী। রেড চেঙের নেতৃত্বে চেন গ্রাম লাল রঙে রাঙিয়ে দেওয়া হল। এরপর বাইরে থেকে চেয়ারম্যান মাওয়ের গলা পর্যন্ত ছবির একটা স্টেনসিল কিনে এনে প্রত্যেক চাষির বাইরের ঘরে মাওয়ের ছবি এঁকে দিল। এইসব কাজ করার পর গ্রামে স্টকি ওয়াঙ আর রেড চেঙের প্রতিপত্তি এতটাই বেড়ে গেল, নতুন পার্টি সেক্রেটারি জিনঈ সব ব্যাপারে ওদের কাছে এসে পরামর্শ নিত। উৎপাদন পরিচালনা করত পুরনো ক্যাডাররা, রাজনীতি ছিল রেডগার্ডের হাতে। কিন্তু ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে এইসব বাড়াবাড়ির সমালোচনা করে যখন জাতীয় পার্টি নির্দেশ পাঠাল, কর্মীদল তখনকার মতো বাক্স-বিছানা গুটিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। এই ঘটনায় ফের মাওবাদী রেডগার্ড কর্মীদলের সমালোচনায় সরব হয়ে উঠল। আবার তারা পোস্টার লিখতে শুরু করল। তবে গ্রামের বেশিরভাগ চাষিই পড়তে জানত না।

চাল ছাড়া শুরুয়া ফোটানো

চেন গ্রামের বাইরের জগতের অবস্থাটা যেন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ল। ১৯৬৭ সালে জানুয়ারির মাঝামাঝি একদিন ক্যান্টনে ডামাডোলের মধ্যে রেডগার্ডের একদল যুবক আর কিছু অভিজ্ঞ ক্যাডার নিজেদের 'বিপ্লবী বিদ্রোহী' ঘোষণা করল। সাময়িকভাবে তারা গুয়াঙদঙ প্রাদেশিক সরকারের রাজনৈতিকভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়া নেতৃত্বের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিল। তারা নিচের স্তরেও এই ধরনের ক্ষমতা দখলের ডাক দিল।

চেন গ্রামের মাওবাদী রেডগার্ডের আঠারো-বিশ বছরের যুবকেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে এই ক্ষমতা দখলের হাওয়ায় মেতে উঠল। এক সন্ধ্যায় তারা হাজির হল ব্রিগেডের সদর দপ্তরে। ক্যাডাররা তখন রাতের খাওয়া সেরে একটা মিটিংয়ে ব্যস্ত ছিল। বিদেশি দেঙ চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা ক্ষমতা দখল করতে এসেছি!' ব্রিগেডের সেক্রেটারিয়াল ক্লার্ক বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে এসো এখানে।' সে ব্রিগেডের সরকারি সিলমোহরটা বার করে বলল, 'কে নেবে বলো?' বিদ্রোহীরা কেউই এগিয়ে গেল না। কারণ সকলেই ছিল অনভিজ্ঞ, ছেলেমানুষ।

আর এক সন্ধ্যায় মাওবাদী রেডগার্ডের জনা বারো ছেলে সাইকেলে চেপে হাজির হল কমিউনের দপ্তরে। সেখানে গিয়ে তারা কর্মীদলের 'কালা

নথিপত্র' দাবি করল। চীনে প্রায় সকলের ওপরই একটা নথি সংরক্ষিত হত। দুজন ওপরতলায় কমিউনের নথি-দপ্তরে উঠে গেল। যে দেরাজের মধ্যে নথিগুলো রাখা ছিল ফিতে বাঁধা অবস্থায়, সেগুলো খুলে দেখা গেল, চেন গ্রামের পঞ্চাশজন যুবক সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য কিছু লেখা নেই।

সেসময় চীন জুড়েই দেখা যাচ্ছিল, গ্রামে পাঠানো যুবকেরা নিজেদের শহরে ফিরে আসছে এবং শহর-কেন্দ্রিক রেডগার্ড সংগঠন গড়ে তুলছে। গ্রামে পাঠানো নিয়েও তাদের কেউ কেউ বলতে শুরু করল, এটা 'লিউ শাও চির 'কালা লাইন'। চেন গ্রামেও মাওবাদী রেডগার্ডের যুবকদের মধ্যে তর্ক দেখা দিল — গ্রামে থাকা হবে, না ক্যান্টনে ফিরে আসা হবে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় মাও নিয়ে পড়াশুনা আরও বেড়ে গিয়েছিল, সেটা একটা সংস্কারের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেকদিন কাজের শুরুতে আর শেষে চাষিদের সারিবদ্ধ হয়ে মাওয়ের এক-একটা উদ্ধৃতি উচ্চারণ করতে হত। একদিন স্টকি ওয়াঙ তার উৎপাদন দলের প্রধানের উদ্দেশ্যে একটা উদ্ধৃতি আবৃত্তি করে উঠল : সমস্ত উদ্ভট, অপদেবতা আর বিষাক্ত আগাছাদের নির্মূল করা হোক!' কথাটার মানে বুঝতে পেরে খেপে গেল দলপতি, সে প্রত্যাহারের সুযোগ না রেখে পাকাপাকিভাবে পদত্যাগ করল।

স্টকি মনে করত, কেউ দুর্নীতি না করলেই তার সব ভালো। ওর উৎসাহী শহুরে ছেলেমানুষী চিন্তায় সেটাই ছিল রাজনৈতিক বিচার। চাষিরা কিন্তু ওভাবে ভাবত না। তাদের দলপতি ছিল গ্রামের মধ্যে প্রথম দু-তিনজন চাষের পরিকল্পনাকারীদের অন্যতম। দলের সকলের কাছে ভালো ফসলই ছিল বিবেচনার। দলের সদস্যদের অনুরোধে সে আপাতত দলপতি হিসেবে কাজ চালাতে রাজি হলেও দলের নির্বাচন দাবি করল। এই নির্বাচনে স্টকির প্রার্থী — আগেকার সহকারী দলপতি — তার কাছে হেরে গেল। স্টকি গ্রামের নানারকম দায়িত্বের পদ দখল করে রেখেছিল। সে সবসময় মিটিংয়ে ব্যস্ত থাকত, দৈহিক পরিশ্রম করত না। ব্রিগেডের নেতারা স্টকিকে এবার কোনঠাসা করতে চাইল। উৎপাদন দলের নির্ধারিত কাজে না থাকলে, মিটিংয়ের সময়ের জন্য তার মাইনে বন্ধ করে দেওয়া হল। স্টকি এতে খুবই অপমানিত হল। সে এরপর দলবদল করে মাওবাদী রেডগার্ডের মুখপাত্র হয়ে উঠল। সে বক্তৃতা ভালোই করত। বিক্ষুব্ধ যুবকেরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গ্রামে একটা সংযোগ স্থাপন করেছিল। স্টকিও এই নতুন বন্ধু খোঁজার জন্য সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দেখা গেল, চেন গ্রামের তুলনায় অন্য গ্রামে বহিরাগত যুবকেরা বেশিরভাগ শ্রমিকশ্রেণীর ঘর থেকে আসা। ক্যান্টনে গিয়ে তাদের চাকরি পাওয়া মুশকিল। তারা জীবিকার জন্যই গ্রামে গিয়েছিল। ক্যান্টনে থাকাকালীন তাদের কাউকে কাউকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কয়েক বছর গ্রামে কাজ করলে তাদের শহরে চাকরি দেওয়া হবে। তারা গ্রামেও চাষিদের ফাঁকি দিয়ে কাজের বাড়তি ওয়ার্কপয়েন্ট আদায় করে নিত; মাঠ থেকে সরাসরি খাবার আত্মসাৎ করত; ব্যক্তিগতভাবে মুরগি রেঁধে খেত; কিছু যুবক-যুবতী একসাথে রাতও কাটাত। চেন গ্রামে কিন্তু চাষিরা সাধারণভাবে বাইরে থেকে পাঠানো যুবকদের প্রতি সদয়। অন্য গ্রামে এদের চাষিরা পছন্দ করত না। কোন কোন গ্রামে উৎপাদন দলের প্রধানেরা এদের ঠকিয়ে কিংবা কঠিন কাজ দিয়ে গায়ের ঝাল ঝাড়ত। এসব দেখে স্টকি এবং চেন গ্রামের বিদ্রোহীরা অন্য গ্রামের বিদ্রোহী যুবকদের সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে পড়ল। গ্রীষ্মকালে একদিন তারা দুটি কমিউনের অন্তর্গত গ্রামগুলোর সমমনস্ক যুবকদের একটা মিটিং ডাকল চেন গ্রামে। গ্রামের নেতারা এদের বাইরে থেকে আসতে দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। যে বাড়িতে মিটিংটা হচ্ছিল, সেখানে উপস্থিত হয়ে নেতারা ক্রুদ্ধভাবে মিটিং বন্ধ করতে বলল। যুবকেরা তা গ্রাহ্য করল না। কিছুদিনের মধ্যে স্টকি ওয়াঙ হয়ে উঠল ক্যান্টনে ফিরে আসা এইসব যুবকদের নেতা। গ্রামে যুবকদের পাঠানোর জন্য লিউ শাও চিকে সমালোচনা করা হল। কিন্তু কোন ফল এতে হল না। শেষপর্যন্ত এদের চেন গ্রামেই ফিরতে হল।

১৯৬৬-র ডিসেম্বরে যখন কর্মীদল হঠাৎ গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল, গ্রামের লোকেরা অনেকটাই স্বাধীন হয়ে স্বস্তি পেয়েছিল। জাতীয় সরকারের সঙ্গে কর্মীদলের মাধ্যমে গ্রামের ওপর যে কর্তৃত্ব কাজ করত, সেটা শিথিল হয়ে গেল। গ্রামের ওপর প্রথমে ক্যান্টনের, তারপর জেলার আর শেষে কমিউন দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দ্রুত সরে গেল। ব্রিগেডের প্রতি ওপরতলার নিয়মিত নির্দেশ আসা বন্ধ হল। মাসে দুবার আর আগের মতো মিটিংয়ে বসতে হচ্ছিল না। উৎপাদন দলগুলোও কোন শাস্তির ভয় ছাড়াই ব্রিগেডের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারত।

কিংফা এবার একটা সুযোগ পেল। ৬ নম্বর দলের প্রধান ছিল কিংফার শালা। সে লঙইয়ং, জিনঈ বা তাদের সঙ্গীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে হটাতে চাইত। লঙইয়ংকে সে ব্রিগেডের উৎপাদন-প্রধান হিসেবে মানতেও চাইত না। এখন আর তার কোন বাধ্যবাধকতা থাকল না। লঙইয়ং যখন গ্রামের একটা রাস্তা আর সেচের উন্নতি করার কর্মসূচি নিল, ৬ নম্বর দল তাতে অংশ নিল না। এতে ব্রিগেড ম্যানেজমেন্ট কমিটি আর লঙইয়ংয়ের কর্তৃত্ব খর্ব হল। এরপর ১৯৬৭-র জানুয়ারিতে মাওবাদী রেডগার্ড ব্রিগেডে চড়াও হয়েছিল। সব মিলিয়ে জানুয়ারির পর ব্রিগেড ম্যানেজমেন্ট কমিটির আর অস্তিত্ব রইল না। সমস্ত উৎপাদন দলের কাজ তদারকি করার ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ল।

এইসময় গুয়াঙদঙ প্রদেশের গ্রামগুলোতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ধরে রাখার জন্য পিপল্‌স লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র দল পাঠানো হয়। চেন গ্রামে তারা একটা নতুন গ্রাম প্রশাসন গড়ার নির্দেশ নিয়ে এল। তারা এসে বলল, গ্রামের গরিব ও নিম্ন-মধ্য চাষিদের সমিতি থেকে এই প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। গতানুগতিকভাবে গরিব চাষি প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে এই 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্বদায়ী ছোটো গোষ্ঠী' তৈরি হল। তিন নম্বর দলের চাষি প্রতিনিধি অসুস্থ থাকায় রেড চেঙ ওই দল থেকে ওই গোষ্ঠীর সদস্য হল। স্টকি ওয়াঙের মতো রেড চেঙ 'মুখে বিপ্লবী' ছিল না। সে যা বলত, কাজে করার চেষ্টা করত। সে হয়ে গেল এই গোষ্ঠীর উপপ্রধান। পিএলএ সেনারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। এই নতুন সংগঠনও তেমন কাজ করল না।

এইবার গ্রামে আনুষ্ঠানিক দায়িত্বের বাইরে এসে কেউ কেউ কাজ করতে শুরু করল। আও, রেড চেঙ, জিনঈ ইত্যাদিরা লঙইয়ংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গ্রামের উৎপাদনের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করার চেষ্টা করল। এতে অন্তত গ্রামের অর্থনীতিটা আপাতত বেঁচে গেল। 'চার সংশোধন'-এর সময় যে নতুন সেচ ও জলনিকাশি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, কর্মীদল যে সমস্ত কৃষিগত উদ্ভাবন করেছিল, তাতে ফল পাওয়া গেল। ১৯৬৭ সালের আবহাওয়াও অনুকূল ছিল। চাষিরা অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজে মন দিল। ফলন হল আগের বছরের থেকে দ্বিগুণ। মাও চিন্তার প্রচারকেরা এই ফলন দেখে গ্রামবাসীর ওপর খুশি হল। যাক! চেয়ারম্যান মাওয়ের শিক্ষার ফলে প্রায় অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পাওয়া গেছে। আর যাই হোক না কেন, সমষ্টিগত মঙ্গলের জন্য অধ্যবসায়, লেগে থাকা আর উদ্যমের শিক্ষার ফল পাওয়া গেছে।

পুরনো বিবাদ ফিরে এল

১৯৪৯-এর বিপ্লবের আগে চেন গ্রামের সঙ্গে মাঝেমধ্যে প্রতিবেশী গ্রামগুলোর সশস্ত্র হানাহানি লেগে থাকত। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে এখন রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলো বিপজ্জনকভাবে অচল হয়ে পড়ল। জায়গাজমি নিয়ে পাশাপাশি গ্রামের মধ্যে পুরনো বিবাদ আবার মাথাচাড়া দিল। ১৯৬৭ সালের

শরৎকালে চেন গ্রামের সীমানায় ছোট্ট নদীর জল প্রবল বর্ষায় ভয়ানক ফুলে উঠল। অতীতে গ্রামবাসীরা এরকম পরিস্থিতিতে নিজেদের মাটির বাঁধগুলো মেরামত করে আরও উঁচু করে দিত, দেখত যাতে জল বাঁধ ছাপিয়ে পাশের গ্রামের মাঠ না ভাসায়। দুই গ্রামের মধ্যে সদ্ভাব তখন বজায় ছিল। এবার দেখা গেল, পাশের গ্রামের লোকেরা চেন গ্রামের দিকের বাঁধ কেটে দিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করল। এই ঘটনা জানতে পেরে চেনের একদল চাষি খেপে আগুন হয়ে গেল। গ্রামের সামরিক দলের হেফাজতে থাকা রাইফেল আর পুরনো মেশিন গান বেরিয়ে পড়ল। সবচেয়ে মাথা গরম করল লঙইয়ং। সে গ্রামের মর্যাদা আর স্বার্থ রক্ষার জন্য যে কোন চ্যালেঞ্জ নিতে এগিয়ে গেল। আও, রেড চেঙ এবং বাইরে থেকে আসা যুবকদের কয়েকজন এই ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীদের শান্ত করার চেষ্টা করল।

সেইসময় কমিউন স্তরের সামরিক বিভাগের অধীনে একটা প্রাথমিক প্রশাসনিক কাঠামো কোনরকমে খাড়া করা হয়েছিল। নতুন নিযুক্ত নেতাদের একজন এই ঘটনা জানতে পেরে এগিয়ে এল। সে পাশের কমিউনের নেতাদের সঙ্গে চটজলদি কথাবার্তা বলে একটা মীমাংসা করল। বাঁধ মেরামত হল, গ্রামে গ্রামে সম্পর্কও মেরামত হল।

কিন্তু গ্রামের ভিতরেও চাষিদের কয়েকজন নিজেদের আর্থিক লাভের জন্য নতুন নেতৃত্বকে মানতে চাইত না। কিংফা তো স্বজনপোষণের দায়ে শাস্তি পেয়েছিল। কিন্তু তারপরেও তার উপস্থিত বুদ্ধি, বোঝানোর ক্ষমতা, উদ্যম, তাকত আর অভিজ্ঞতার জন্য লোকে তাকে সমীহ করে চলত। সে তার উৎপাদন দল নিয়ে বেআইনি কারবার আর মুনাফা চালিয়ে যাচ্ছিল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডামাডোলে চেন গ্রামের সুস্থিতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গ্রামে যে হাঁসমুরগি চড়ে বেড়াত, সেগুলোর চুরি খুব বেড়ে গেল। পাহাড়ে নানারকম অবৈধ যৌন কার্যকলাপের কথাও শোনা যেতে লাগল। শর্টি নামে এক যুবক — ৮ নম্বর দলের গরিব চাষিদের প্রতিনিধি — জননিরাপত্তা কমিটির সদস্য হয়েছিল। শর্টি বিয়ে করল ৩০ বছর বয়স্ক এক কর্মঠ বিধবা মেইয়েন-কে। কিন্তু বিয়ের পর সে লিলোউ নামে অপর এক মহিলার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক রাখত। লিলোউয়ের বিয়ে হয়েছিল ১৯৪৯ সালে এমন এক পুরুষের সঙ্গে, যাকে সে একদম পছন্দ করত না। সে তৎকালীন ভূমি সংস্কার কর্মীদলের কাছে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেছিল। ক্যাডাররা দেখল, লিলোউ চলে গেলে তার স্বামীর আর বিয়ে হবে না। ব্রিগেডের পুরুষ ক্যাডাররা এই কথা চিন্তা করে লিলোউয়ের আবেদন অগ্রাহ্য করল বারবার, দু'দশক ধরে। সে একবার গ্রাম থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফের তাকে খুঁজে ধরে আনা হল। লিলোউ ছিল দলগত কাজকর্মে পটু আর কথা বলতে পারত। ১৯৫৮ সালে তাকে পার্টি সদস্য করা হয়েছিল। লিলোউ নিজের স্বামীর প্রতি বিক্ষোভ থেকে বাইরে অবাধ যৌনজীবন শুরু করেছিল। তার এই নৈতিক অধঃপতনের জন্য তাকে 'চার সংশোধন' কর্মীদল পার্টি থেকে বহিষ্কার করেছিল।

লঙইয়ং শর্টির সঙ্গে লিলোউয়ের অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে ব্রিগেডের জননিরাপত্তা কমিটির কাছে হৈচৈ শুরু করল। কমিটির নেতা যখন এই বিষয়ে গ্রামের সকলকে মিটিংয়ে ডাকল, শর্টি এসে উল্টে নিজের বৌয়ের কামশীতলতা নিয়ে অভিযোগ করল। প্রচণ্ড রাগে-অপমানে মেইয়েন পাল্টা নিজের যৌন-সক্ষমতার বর্ণনা দিতে শুরু করল আর্তনাদ করে। গ্রামের লোক হতভম্ব হয়ে গেল। কমিটির নেতাও পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা করল। লঙইয়ং মঞ্চে এসে চিৎকার করে বলল : 'যদি একটা গরু জল না খেতে চায়, তুমি তার মুখটা জলের মধ্যে চেপে ধরো'। অর্থাৎ সে শর্টিকে নিজের বৌয়ের ওপর জোর না খাটানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত করল। মিটিংটা পণ্ড হয়ে গেল। এরপর থেকে শর্টিকে জননিরাপত্তা কমিটির মিটিংয়ে আর ডাকা হত না। ব্রিগেড দ্রুত মেইয়েনের বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর করল। এর কিছুকাল বাদে মেইয়েনকে শর্টির জায়গায় জননিরাপত্তা কমিটির মিটিংয়ে ডাকা হত।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমাপ্তি হল। মাও সেতুঙের বিরোধীদের পতন হল। আবার সুস্থিতি ফিরে এল। ১৯৬৮ সালের মে মাসে শুরু হল 'শ্রেণী পর্যায়ভুক্তদের সাফাই কর্মসূচি'।

---

২ পৃষ্ঠার শেষাংশ ... পঁচিশ বছরে 'সি'

থেকেছেন বিভিন্ন সময়ে যাঁরা 'সি' নাটকে অভিনয় করেছেন, তাঁরা প্রায় সবাই। এবং এক অভিনব ভঙ্গি ছিল ওই সেদিন 'সি' নাটকের প্রযোজনার — যাঁরা অভিনয় করেছিলেন একদিন, তাঁরা কেউ কেউ শুরু করলেন নাটকটি। কিছুক্ষণ চলার পর শিশু অভিনেতা উজান চট্টোপাধ্যায়ের 'আয়, আরেকটিবার আয়রে সখা'-র সুললিত গায়নে যেন ব্যাটনের হস্তান্তর ঘটল, অভিনয় অঙ্গনে প্রবেশ করলেন এখনকার অভিনেতারা, আলিঙ্গন করলেন অতীতের অগ্রজদের, যেন বা পতাকা বয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি-শুভেচ্ছা প্রার্থনা করা হল, অভিনয় চলল এরপর থেকে। সে ছিল এক আনন্দময় বিষাদের ছবি। সেদিনের আরও উপরি পাওনা কলকাতা থেকে আগত প্রখ্যাত নট-পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্যামল ঘোষ এবং শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা ঘোষের উপস্থিতি।

পঁচিশ বছর পূর্তির দুদিনের অনুষ্ঠানের প্রথম দিন ছিল সাংস্কৃতিক-এর 'সি' এবং শান্তিপুরের আরেকটি প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল 'রঙ্গপীঠ'-এর নাটক 'আন্ধার নগরী চৌপাট রাজা' প্রযোজনা। সঙ্গে সাংস্কৃতিক-এর কচিকাঁচাদের গান — ওদেরই ছোটোদের প্রযোজনায় যেসব গান ব্যবহৃত হয়েছিল তারই কয়েকটি। শান্তিপুর বুড়োশিবতলা প্রামাণিক ঠাকুরবাড়ির অঙ্গনে ছিল প্রথম দিনের অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিনও ছিল সাংস্কৃতিক-এর 'সি' এবং 'আবহমান' হালিশহরের নাটক 'টেপরেকর্ডার'। এই দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান ছিল সূত্রাগড় এম এন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে। সঙ্গে ছোটো-বড়োদের গান। এই যে আজ পঁচিশ বছর উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানকেও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া, বহু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার যে চাওয়া — এর ভেতরেই সম্ভবত সাংস্কৃতিক তাদের জীবনীশক্তি ধরে রাখতে চায়। দুদিনের ওই অনুষ্ঠান, তার পরিকল্পনা, রূপায়নের অভিনবত্ব মুগ্ধ করেছে উপস্থিত সবাইকে।

সবার শেষে যাদের কাছে শ্রদ্ধায় আনত হয়ে থাকতে হয়, তারা শান্তিপুর সাংস্কৃতিক-এর এক বিশাল কর্মীদল। এবং উল্লেখ্য তাদের বেশিরভাগই বর্তমান অগ্রবর্তীদের অনুজ। ওই দুদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় আলাদিনের সক্ষমতায় প্রামাণিক ঠাকুরবাড়ির অঙ্গন এবং সূত্রাগড় হাইস্কুলের অঙ্গনটি কাপড়, মুখোশ ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়েছে, রেখেছে সাংস্কৃতিক-এর প্রযোজনার সেই গোড়া থেকে একটি ফটো-এগজিবিশন। অসামান্য সেই পরিবেশন। এবং যখন কোন একটি অনুষ্ঠানে প্রায়শই নানারকম অপ্রস্তুত-উপস্থাপনা আমাদের অস্বস্তিতে ফেলে, বিরক্ত করে, সেখানে তাদের প্রতিটি কাজই ছিল নিখুঁত এবং পরিমিত। একেবারে সাত বছরের শিশুটি থেকে সাতচল্লিশের প্রতিটি কর্মী কীভাবে সক্রিয় তা ধরা পড়েছে ৭ ফেব্রুয়ারির সকালে অনুষ্ঠিত পদযাত্রায় — প্রত্যেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে অনেককে, হাত ধরে নিয়ে এসেছে বাড়ির দুজনকে। এমন এক বিস্তারের জন্য, এমন এক আন্তরিক সম্মিলিত সৃষ্টি-আখ্যান গড়ে তোলবার জন্যই তো শুরু হয়েছিল সাংস্কৃতিক-এর পথ চলা — সেই পঁচিশ বছর আগে।

চীনের কমিউন

তমাল ভৌমিক

চীনে সমাজতন্ত্রের যে চেহারা আমরা গড়ে উঠতে দেখেছি, তাতে এটা বলাই যায় তার মূল কোষ ছিল কমিউনগুলো। কমিউনগুলো গড়ে উঠেছিল একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে, আবার ভেঙ্গে গেছে অন্য এক বা একাধিক প্রক্রিয়ার যোগসাজশে। তাতে চীনের সমাজবাদ বুর্জোয়া–জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন আলাদা। আমাদের অন্বেষণ কমিউনের ভাঙ্গা–গড়াকে ঘিরে।

এইসব বিষয়ে খোঁজখবর চালাতে গিয়ে দেখা গেল, একই বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে দুরকম মত পাওয়া গেছে। আমরা দু'রকম মতই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যাতে ঠিক কী হয়েছিল তার খানিকটা ধরা যায়। অবশ্য তার বাইরেও একাধিক মত থাকতেই পারে। কেমন, বলছি।

যেহেতু পঞ্চাশ ষাট বছর আগের ঘটনা, তাই যাঁরা তখন চীনে গিয়েছিলেন, যেমন জ্যাক বেলডেন, উইলিয়াম হিন্টন, ফেলিক্স গ্রীন ও এডগার স্নো'র মতো আমেরিকান সাংবাদিক বা হুইলরাইট ও ম্যাকফারলেনের মতো অস্ট্রেলিয়ান বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখার ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। কিন্তু এঁরা চীনের যে অংশগুলোয় ঘুরেছিলেন তা ছিল চীনের মূল ভূখণ্ডের মধ্যে, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে কৃষিপ্রধান এলাকায়। এর বাইরে সংখ্যালঘুদের যে বিশাল এলাকা — চীনের প্রায় ষাট শতাংশ — – সেখানকার অবস্থার প্রতিফলন এঁদের লেখায় তেমন পাওয়া যায় না। কাজেই ওখানকার জাতিসত্তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান; ভূমি সংস্কার, কমিউন গড়া বা অন্য কোন রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপে সমাজের ভিন্ন ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার কথা এই আলোচনার পরিসরের বাইরে থেকে যাচ্ছে।

তাছাড়া, পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতারা কী ভেবে কী করেছেন, তার একটা গুরুত্ব থাকলেও, বাস্তবে তা সাধারণ মানুষের সমর্থন কেমনভাবে পেয়েছে বা পায়নি এবং তার ফলে সমাজের বহুমুখী যে নড়াচড়া, সেটাকেও যুক্ত করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এর জন্য ভিন্ন চরিত্রের এবং পরস্পর–বিরোধী তথ্যসূত্র কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

কমিউন গড়ে তোলার ডাক সরকারিভাবে দেওয়া হয় 'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড' আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৫৮ সালে। তার আগে চীনের অবস্থা কীরকম ছিল?

দুর্ভিক্ষের দেশ

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস বলছে, "১৯৪৯ সালে দেশ আক্রান্ত হয়েছে খরা, তুষারপাত, কীটপতঙ্গের মহামারী, ঝড়, শিলাবৃষ্টি আর বন্যায়। বিশেষ করে বন্যা এমন ভয়ানকভাবে হয়েছে যে দশ কোটি মউ (১৫ মউ = ১ হেক্টর) জমি ভেসে গেছে, ৪ কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত। ... জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছে, তারা যেন সাশ্রয় করে চালায় এবং একে অপরকে সহায়তা করে, প্রত্যেক অফিস–কর্মীকে বলা হয়েছে তারা যেন দিনে অন্তত পঞ্চাশ গ্রাম চাল বাঁচায়।"

এইরকম অবস্থা চীনে কিছু নতুন না। চীনকে বলা হত 'দুর্ভিক্ষের দেশ'। কেম্ব্রিজ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ চায়না–তে দেখা যাচ্ছে চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত 'এক্সকালেনটিস্ট' নামক এক আন্দোলন ছিল চীনে। সেই আন্দোলনকারীদের কাজ ছিল দুর্ভিক্ষের সময় কী কী ফলমূল খাওয়া যেতে পারে তা খুঁজে বার করা। অত পুরনো কথা থাক। 'চায়না শেক্স দ্য ওয়ার্ল্ড' বইতে ১৯৪১ সালে জ্যাক বেলডেন লিখছেন, "কম্যুনিস্টরা বলে, যেহেতু ঈশ্বর আমাদের সহায় নন, তাই পরপর তিনবছর দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে। ... শুরুতে তাইহাং ও তাইউহে পাহাড়ে চাষ মার খেল, দক্ষিণ হোপেইতে বন্যা ও হোনানে পঙ্গপালের আক্রমণ দ্রুত চারটে প্রদেশেই ছড়িয়ে পড়ল। এর মধ্যে দশলক্ষ ক্ষুধার্ত উদ্বাস্তু কুয়োমিনটাঙ অধিকৃত হোনানের এলাকা ছেড়ে ইয়েলো নদী পার হয়ে সীমান্তে চলে এল। এইসব উদ্বাস্তু পরিবারের প্রতি দশজনের মধ্যে পাঁচজনই তাদের জন্মভূমিতে মারা গেছে, বাকি পাঁচজন কম্যুনিস্টদের এলাকায় চলে এসেছে প্রাণ বাঁচাতে। সীমান্ত অঞ্চলে তাদের জমি, টাকা ও খাদ্য দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও শস্য ভালো ফলেনি, কত আর ত্রাণ দেওয়া যায়।

হোনানে তাইহাং পাহাড়ের রাস্তাগুলো মৃতদেহে ভর্তি হয়ে গেল। ১৯৪২–এর বসন্তে সব গাছের কুঁড়িগুলো মানুষ খেয়ে ফেলল। প্রত্যেকটা গাছের ছাল ছাড়িয়ে মানুষ এমনভাবে খেয়ে ফেলেছে যে তাদের সাদা কাণ্ডগুলো দেখে মনে হচ্ছে জামাকাপড় খুলে নেওয়া ন্যাংটো মানুষের দল। কোনও কোনও জায়গায় মানুষ গুটিপোকা খেয়েছে, আশ্চর্যজনকভাবে অনেকেই সাদা মাটি তুলে খেয়েছে — এদের অল্প কিছু সময়ের জন্য খিদে মিটেছে, তারপর এরা মারা গেছে। মহিলারা একে অপরের সাথে শিশু–সন্তান পাল্টে নিয়ে বলেছে, 'তুমি আমারটাকে খাও, আমি তোমারটাকে খাই।' মৃতপ্রায় মানুষ মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার ভেতরে ঢুকে প্রতিবেশীদের বলেছে মাটি চাপা দিয়ে দিতে। কারণ পরে যারা বেঁচে থাকবে তারা যদি এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে আর মাটি খুঁড়তে না পারে বা সবাই যদি মরে যায়। মানুষ প্রথমে সন্তানকে, পরে স্ত্রীকে বেচে দিচ্ছে। যারা বেঁচে থাকছে, তারা এত দুর্বল যে যেখানে বৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে চাষ করার শ্রমটুকুও দিতে পারছে না।

সীমান্তে জাপানীদের অধিকৃত[2] মনুষ্যবাসহীন এলাকায় কোনও কুকুর, বিড়াল, শুয়োর, মুরগি কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। অতএব পশু–প্রজননও হচ্ছে না। মানুষ পরিবার সমেত আত্মহত্যা করছে। পরিবারের প্রধান অন্য সবাইকে জ্যান্ত কবর দিয়ে শেষে নিজে মরছে। ...

১৯৪১, ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সাল সীমান্ত–এলাকার ইতিহাসে এবং সম্ভবত উত্তর চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ সময়। নিজেদের সরকার ও সৈন্যবাহিনী সহ জনসাধারণ যে টিকে থেকে জয়লাভ করতে পেরেছে সে শুধু কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বের জন্য। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে অষ্টম রুট বাহিনীর সমস্ত সদস্য এবং সমস্ত কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য গ্রামগুলোর উৎপাদনের পরিচালনার ভার গ্রহণ করল। তখন একটা স্লোগান দেওয়া হত, 'কম্যুনিস্ট পার্টির একজন ভালো সদস্য মানে একজন ভালো উৎপাদক।' অতএব সেনারা ও পার্টি–সদস্যরা সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে খাল কাটল, কুয়ো খুঁড়ল, মাঠে চাষ করল, শুকনো খেতে জল বয়ে নিয়ে গেল আর লাঠি হাতে পঙ্গপাল তাড়াল। একইসঙ্গে পার্টি–কর্মী, সৈন্য আর সরকারি কর্মচারীদের রেশন অর্ধেক করে দেওয়া হ'ল। পাহাড় থেকে বুনো লতাপাতা তুলে এনে জোয়ারের সাথে রান্না করে খাবারের খামতি পোষানো হ'ল। তাতে পুরুষ–নারী নির্বিশেষ সবাই এমন দুর্বল হয়ে পড়ল যে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে অনেকে মাথা ঘুরে পড়ে গেল এবং অনেকেই দুর্বল স্বাস্থ্যে অধিক পরিশ্রম করায় হার্টের অসুখে ভুগতে থাকল।"

---

[2] **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান সহ পাঁচটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ চীনের ওপর কর্তৃত্ব করত। এই ব্যাপারে তাদের সহায়ক শক্তি ছিল চীনা সামন্তপ্রভুরা। ১৯৩১ সাল থেকেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের ওপর বড়ো ধরনের হামলা চালায় এবং চীনা প্রজাতন্ত্রের বড়ো এক অংশ দখল করে রাখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। অধিকৃত এই অঞ্চলের কথা বলা হচ্ছে।**

এই সময়ে বেলডেনের হিসেবে "জাপ-বিরোধী যুদ্ধ চলাকালীন এবং তারপরে হোনান, হুপে ও হুনান প্রদেশে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মউ জমিতে চাষ হয়নি আর এক থেকে দেড় কোটি চাষি অনাহারে মারা গিয়েছিল। তবু চিয়াং কাইশেকের আমলারা ক্ষমতা ও গায়ের জোরে জমি দখল করছিল। সেচুয়ান অঞ্চলের একটা হিসেবে দেখা যায়, আট বছর যুদ্ধ চলাকালীন মোট জমিদারদের ২০ থেকে ৩০ শতাংশ নতুন ভূস্বামীরা পুরনো ভূস্বামীদের ৯০ শতাংশ জমি দখল করেছে। ... একই সময়ে, ঋণ শোধ করতে না পারা ও জমি বন্ধকী রাখার জন্য জমি হারানো চাষিদের সংখ্যা হাজারে হাজারে বেড়েছে। উত্তর চীনের দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যশস্যের জন্য যারা জমি বন্ধক দিয়েছিল, তারা ২-৩ বছরের মধ্যে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। এই কারণে সাতজনের পরিবারে তিন-চারজনের উপবাসে মৃত্যু খুব স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। জমির পুঞ্জীভবনের অর্থ হয়ে দাঁড়াল মৃত্তিকাকে উর্বর করার জন্য মৃতদেহের পুঞ্জীভবন। কিন্তু একই সাথে তা হয়ে দাঁড়াল কৃষিবিপ্লবের জন্য সহস্র আত্মার একতা।"

বর্ণনাটা একটু বড়ো হয়ে গেল। এর থেকে সহজেই বোঝা যায়, ১৯৪৫ সালে জাপ-বিরোধী যুদ্ধ শেষ হওয়ার চার বছরের মধ্যে কেন চিয়াং কাইশেকের[3] কুয়োমিনটাঙ বাহিনীকে হারিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করতে পেরেছিল। সৈনিকরা হবে চাষি আর চাষিরা হবে সৈনিক, এই ছিল চৈনিক ভূমি জাগরণের মূল মন্ত্র। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের ঘাঁটি ছিল শহরে-শিল্পাঞ্চলে-সোভিয়েতে আর চীনে তা গ্রাম-কৃষকদের মধ্যে — কমিউনে। অনেক বিশেষজ্ঞই তাই চীনের সমাজতন্ত্রকে কৃষি-সমাজতন্ত্র আখ্যা দিয়েছেন। উত্তর-পূর্বে চীনের মুক্তাঞ্চলে চাং চিয়াং গ্রামকে নিয়ে লেখা উইলিয়াম হিন্টনের 'ফানশেন' বইতে আমরা দেখেছি — ১৯৪৯-এর আগেই কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে গ্রামগুলোতে, জমির মালিকানার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, একরকমভাবে ভূমি সংস্কার শুরু হয়ে গিয়েছে। যেমন, চাং চিয়াং গ্রামে ১৯৪৪-এ মুক্তির সময় থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে গ্রামের মোট ২৫১টা পরিবারের হিসেবে দেখা যায় :

১৯৪৪		
	পরিবার (লোকসংখ্যা)	জমি (মৌ এককে)
জমিদার	৭ (৩৯)	৬৮০
ধনী চাষি	৫ (২৭)	৩০৩
মাঝারি চাষি	৮১ (৩৯৫)	২৫৩২.৬
গরিব চাষি	১৩৮ (৪৬২)	১৩৮৬.০৪
ভূমিহীন	২০ (৬৪)	—

এই গরিব চাষিদের এবং ৫৯ জন সদস্য বিশিষ্ট ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে জমিদার ও ধনী চাষিদের জমি বন্টন করায় নতুন মাঝারি চাষির জন্ম হল। এদের ৫২৩ সদস্য বিশিষ্ট ১৪০ পরিবারের হাতে এল ৩০৪৮.৩ মৌ জমি। সব মিলে যা হল তাতে গ্রামের ৯৮.৫ শতাংশ মানুষ গরিব বা মাঝারি চাষি। তাদের হাতে মাথা পিছু ৫ থেকে ৬ মৌ বা ৩ বিঘা জমি। চীনবিপ্লবের পর কম্যুনিস্ট পার্টির সরকার যে কর্মসূচিগুলো নিয়েছে, সেখানে এই নবগঠিত গরিব ও মাঝারি চাষি (বিশেষত নিম্ন-মধ্য চাষি) গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল স্তরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৪৮		
	পরিবার (লোকসংখ্যা)	জমি (মৌ এককে)
জমিদার	১ (২)	১৩.৫
ধনী চাষি	৪ (১২)	৫৫.৫
পুরনো মাঝারি চাষি	৭৬ (৩৪১)	২০৫৬.৬
নতুন মাঝারি চাষি	১৪০ (৫২৩)	৩০৪৮.৩
গরিব চাষি	২৯ (৮২)	৪১৫.৮

চাং চিয়াং গ্রামের চেহারা থেকে গোটা চীনের অবস্থা সবটা বোঝা যাবে এমনটা কেউই দাবি করবে না। বিশ্বে জনসংখ্যায় প্রথম ও আকারে তৃতীয় বৃহত্তম হলেও চীনের চাষযোগ্য জমি মোট জমির শতাংশের হিসেবে মাত্র ২০। চীনের উত্তর-পশ্চিম এবং গোটা পশ্চিমাঞ্চলে ইনার মঙ্গোলিয়া, গুয়াংসি, নিংসিয়া, সিংজিয়াং ও তিব্বত; সেখানে শুধু পাহাড়-জঙ্গল এবং এরকম প্রায় ৬০ শতাংশ অঞ্চলে ৬ শতাংশ সংখ্যালঘুর বাস যাদের মধ্যে প্রায় ৫০ রকম নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে। সংখ্যাগুরু ৯৪ শতাংশ হানরা পূর্ব-চীনে সমুদ্রবর্তী অঞ্চলে ঘনবসতিপূর্ণ অংশে থাকে। এরকম একটা অবস্থায় বিপ্লবের পরে সরকারের কাছে মূল বিষয়টা দাঁড়াল, প্রথমে ওই ২০ শতাংশ চাষের জমি কাজে লাগিয়ে তখনকার প্রায় ৫০ কোটি চীনা জনসাধারণের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২-র এই তিনবছর সময়টাকে তাই বলা হয় পুনর্বাসনের সময় বা থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার সময়, যার ভরকেন্দ্রে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামের মানুষ।

পুনর্গঠন পর্ব

পুনর্গঠনের কথায় যাওয়ার আগে 'ফানশেন'-এর কথা বলি। 'ফানশেন' মানে পরিবর্তন, যা নিয়ে উইলিয়াম হিন্টনের চাং চুয়াং গ্রামের কাহিনী। কাহিনীকে দু'ভাগ করলে পাই কিছু তথ্য, কিছু ঘটনা। তথ্য থেকে আন্দাজ করা যায়, উপরে উল্লিখিত মাথাপিছু ৩ বিঘা জমিতে চলে যাওয়ার কথা। চলে যাওয়ার মানে ঠিক কী, সে প্রশ্নে এখন গেলাম না। অন্তত দুর্ভিক্ষের সময়ের যে ছবি দেখেছি, তার তুলনায় অনেক ভালো এটা তো বলাই যায়। পরে এই সমস্ত জমি জুড়ে কমিউন হবে — সেটা পরে দেখব।

একনজরে দেখা যাক, ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ এই তিন বছরের পুনর্গঠনের সময় কী কী হয়েছিল। বেজিং ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেস থেকে মা হাং সম্পাদিত, ১৯৯০ সালে প্রকাশিত 'মডার্ন চায়না'জ ইকনমি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট' বইতে বলা হয়েছে, পুনর্বাসনের কাজ নানা ভাবে এগিয়েছে। প্রথমত জোর দেওয়া হয়েছে সর্বক্ষেত্রে উৎপাদনের পুনরুজ্জীবনে — এর জন্যে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন ও রাস্তা ১৯৫০-এর মধ্যেই প্রায় সব সারিয়ে ফেলা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে রাষ্ট্র কৃষি-খামারগুলোকে ঋণ দিয়ে, সার, যন্ত্রপাতি ও কীটনাশকের সরবরাহ সংগঠিত করে কৃষি ও তার সহযোগী উৎপন্ন দ্রব্যগুলোকে উচিত দামে কিনে নিয়েছে। বহু জায়গায় চাষের কাজে লাগানোর জন্য জলাধার তৈরি হয়েছে। রেল ও যোগাযোগের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অধীনে থাকলেও মোট শিল্প-উৎপাদনের ৪০ শতাংশ ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে। পাশাপাশি পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানাধীন যে শিল্প সংস্থাগুলি ছিল, ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২-র মধ্যে তাদের উৎপাদন বেড়েছিল ৫৪ শতাংশ।

[3] **১৯১১ সালে কুইং রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯২১-এ চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা ও কমিউনিস্ট আন্দোলন বেড়ে ওঠার পরে সান ইয়াৎ সেনের কুওমিনটাঙ ও কম্যুনিস্ট পার্টির যুক্ত আন্দোলন চলতে থাকে চীনের সামন্তপ্রভু ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে। ১৯২৫-এ সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর কুওমিনটাঙ বাহিনীর নেতা হন চিয়াং কাইশেক। চিয়াং কাইশেকের দলের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির যুক্ত বাহিনী জাপানীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে লড়াই চালিয়েছিল, তাকেই জাপ-বিরোধী গৃহযুদ্ধ বলা হয়।**

মোট শিল্প উৎপাদন এই তিন বছরে ১৪৫ শতাংশ বেড়েছিল।

১৯৪৯-এর আগে ভূমি সংস্কার একভাবে শুরু হলেও ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়ন করা হয় ১৯৫০-এর জুনে। ১৯৫২-র মধ্যে ভূমি সংস্কারের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়। বাকি থাকে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাদের এলাকাগুলো। ৩০ কোটি চাষির মধ্যে ৪ কোটি হেক্টর জমি বন্টন করা হয়। তারপর তাদেরকে পারস্পরিক সহায়তাকারী 'মিউচুয়াল এইড টিম' এবং 'কো-অপারেটিভ'-এর মধ্যে নিয়ে আসা হয়। ১৯৫২ সালে এরকম 'মিউচুয়াল এইড টিম' ছিল ৮০ লক্ষ এবং কো-অপারেটিভের সংখ্যা চল্লিশ হাজার। ফলাফল, কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি ৪৮.৫ শতাংশ। এক কথায় অর্থনীতির প্রায় সব বিভাগেই ১৯৫২ সালের উৎপাদন ১৯৪৯-এ মুক্তির আগের সর্বোচ্চ উৎপাদনের মাত্রাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। উন্নয়নের এই চেহারার বর্ণনায় আর যা বলা হয়েছে, তা হ'ল, চীনা শ্রমিক ও কর্মচারীদের গড় মাইনে ৭০ শতাংশ এবং কৃষকদের আয় গড়ে ৩০ শতাংশ বেড়েছিল।

এইসব পরিসংখ্যান থেকে আমরা শুধু এটুকুই বুঝতে চাইছি, গ্রাম এবং চাষিদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের গতিমুখটা কী ছিল। গ্রামে সর্বত্রই (এমনকী ভারতেও) সমাজের নিচেরতলায় এক ধরনের সহযোগিতা থাকে, বিশেষত চীনের গ্রামের মানুষের দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা ছিল টাটকা। কম্যুনিস্ট পার্টির পরিচালনায় চীনা সরকার তাকে একটা সংগঠিত রূপ দিতে চেয়েছিল। সেখান থেকেই পরপর 'মিউচুয়াল এইড টিম' এবং সমবায় গঠন। এই ছিল চীনের কমিউন গড়ার পটভূমি।

কো-অপারেটিভ থেকে কমিউনে

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ ছিল চীনের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। উন্নয়নের ফিরিস্তি দেখলে বোঝা যাবে, ১৯৫২ সালের তুলনায় মোট উৎপাদিত মূল্য কমপক্ষে ৮৫.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় আয়ের ১৭.৯ শতাংশ স্থির পুঁজিতে (অর্থাৎ যন্ত্রপাতি) বিনিয়োগ করা হয়েছে, যা ১৯৫০-এ ছিল ৫.৫ শতাংশ ও ১৯৫৮-তে হয়েছে ২৫ শতাংশ। এইসব শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পাশাপাশি এই গোটা পর্যায় জুড়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতেও বিনিয়োগ হয়েছে — ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৮-র মধ্যে চার লক্ষ একত্রিশ হাজার ছাত্র গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, যার মধ্যে এক লক্ষ তিরিশ হাজার ইঞ্জিনিয়ার। কলেরা, টাইফয়েড, প্লেগের মতো মহামারীকে নির্মূল করা গেছে। এই সমস্ত তথ্যগুলো ১৯৬৯ সালে, অ্যাংলো চাইনিজ এডুকেশনাল ইন্সটিটিউটের নিকোলাস বার্নারের 'চায়না'জ ইকনমি' নামক পুস্তিকা থেকে নেওয়া। নিয়েছেন, হুইলরাইট ও ম্যাকফারলেন এবং তাঁদের লেখা 'চাইনিজ রোড টু সোস্যালিজম' বইতে একথাও প্রকাশ করেছেন যে কমিউনে যেসব বয়স্ক লোকেদের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল তারা জানিয়েছে যে, ওই সময়ের 'কো-অপারেটিভ' গড়ে তোলার আন্দোলনে যে বয়স্ক শিক্ষা শিবির চালু হয়েছিল, সেখানে তারা লিখতে পড়তে ও হিসেব করতে শিখেছে।

এখানে ভিন্ন সুরের বক্তব্য হিসেবে 'হাংরি ঘোস্টস্'-এর লেখক জেসপার বেকারের বক্তব্য দেখা যাক, "পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় 'গণতান্ত্রিক সংস্কার'এর নামে কৃষকদের জগৎ ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্য কৃষকদের জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে পার্টি আক্রমণ নামিয়েছিল। ভালোর দিকে — সাক্ষরতা বাড়ানো, মহিলাদের মান্যতা দান, জনস্বাস্থ্য ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে; পায়ের পাতা ছোটো করার চীনা কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ ও আফিমের নেশা ছাড়ানো হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য পরিবর্তন কৃষকদের জীবনকে খাটো করে ফেলেছে।

১৯৪৯-এর পর প্রথম আট বছরের মধ্যে কৃষকদের ধর্মীয় জীবন শেষ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত মন্দির-মসজিদ-গুম্ফা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফেংশুই-জ্যোতিষ নিষিদ্ধ। ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, বৌদ্ধ, দাওবাদী — সমস্ত রকম ধর্মবিশ্বাসের যে পুরোহিতেরা কৃষকদের সান্ত্বনা দিত ও পথ দেখাত, তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, পদচ্যুত করা হয়েছে বা গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান কৃষিচক্রের প্রতিটি দশাকে কিছু মানে জোগাতো, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কৃষকের জীবনের বিশেষত্বকে চিহ্নিত করত, তা নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে বা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। চিরাচরিত সাংস্কৃতিক উৎসবের পরিবর্তে পার্টি চালু করেছে অবিরাম রাজনৈতিক সভা আর প্রচারমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কৃষকদের লোকসংস্কৃতি ছিল চাষের কাজের সময় গান করা বা হাটে মেলায় যাত্রা (অপেরা) করা। যেমন জিয়াংসু প্রদেশে বীজ বোনা, কাটা ও ঝাড়াইয়ের সময় তারা নানা রকমের গান গাইত এবং ধানখেতে কাজ করার সময় দীর্ঘ মহাকাব্য অনেকদিন ধরে শুনত। এখন তাদের প্রেমের গান এবং যাত্রাও করা চলবে না। হাট-বাজার বন্ধ। কারণ এখন জাতীয় পুনর্গঠনের সময় — এখন এসব বাড়তি খরচ ও অপচয় করা উচিত নয়।"

উদ্ধৃতিগুলো লম্বা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে থেকেই আমাদের খানিকটা বুঝে নিতে হবে। এইসময়ে চীনে পাঁচ থেকে পনেরটি পরিবারের পারস্পরিক সহযোগী দল (মিউচুয়াল এইড টিম) থেকে বড়ো করে ২০-৪০টি পরিবারের কো-অপারেটিভ গড়ে তোলা হচ্ছে। ১৯৫৫ সালে 'অন দ্য কোয়েশ্চেন অফ এগ্রিকালচারাল কো-অপারেশন'-এ মাও সেতুং লিখেছেন, "সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সর্বত্র ধনী কৃষকদের উত্থান আর অনেক উচ্চ-মধ্য কৃষকদের[4] ধনী কৃষক হওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই এটা বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে অনেক গরিব কৃষকই দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কারণ তাদের যথেষ্ট উৎপাদনের হাতিয়ার নেই ..."। এখান থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত টানছেন যে, পশু দিয়ে ছোটো জমি চাষের পরিবর্তে দ্রুত বড়ো বড়ো কো-অপারেটিভ গড়ে তুলতে হবে — যেখানে বড়ো আকারে চাষ হবে যন্ত্রের সাহায্যে, হবে জমি-মালিকানার রাষ্ট্রীয়করণ। একদিকে, ওইসময়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনের নিম্নহার; অন্যদিকে, বিক্রয়যোগ্য শস্য ও শিল্পের কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান চাহিদা — এই দ্বন্দ্বেরও নিরসন হবে বড়ো কো-অপারেটিভের মাধ্যমে। আর এসবের মধ্যে দিয়েই 'সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন'-এর সমস্যা মিটবে।

এবার ২০-৪০ পরিবারের সদস্যদের নিম্নস্তরের ছোটো ছোটো কো-অপারেটিভের পরিবর্তে ১০০-৩০০ পরিবারের উচ্চস্তরের সমবায় তৈরি হতে লাগল। আগের নিয়মে সমবায়ের সদস্যদের শ্রমের বিনিময়ে এবং সমবায়ে তাদের দেওয়া সম্পত্তির বিনিময়ে অর্থ দেওয়া হত। এখন বড়ো সমবায়ে শুধু শ্রমের বিনিময়ে মজুরি মিলল। অতএব শুধু সমবায়ের আয়তনেরই বদল হল না, তার চরিত্রেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বদল হল। যদিও যেসব কৃষকের গৃহপালিত পশু নেওয়া হয়েছিল, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে ১৯৫৬-র শেষে কৃষিজীবী পরিবারগুলোর ৮৮ শতাংশ উচ্চতর কো-অপারেটিভের সদস্য হয়েছিল। গ্রামজোড়া এমন সব কো-অপারেটিভই হয়ে দাঁড়িয়েছিল গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক একক।

আবার জেসপার বেকারের বিরোধী বক্তব্যে ফিরে যাই, "চাষিদের কাছ থেকে জমি সরকারিভাবে কেড়ে নেওয়া হয়নি, কিন্তু তাদের জোর করা হয়েছিল ... তাদেরকে মিটিংয়ে ডেকে দিনের পর দিন এমনকী এক সপ্তাহও আটকে রাখা হ'ত, যতক্ষণ না তারা নিজে থেকে সমবায়ে যোগ দিতে চাইত ...।

১৯৫৬ সালে স্তালিনের মতো মাও দেশের ভেতরে পাশপোর্ট চালু

[4] **মাও সেতুঙ চীনের মাঝারি কৃষককে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন : উচ্চ-মধ্য, মধ্য-মধ্য ও নিম্ন-মধ্য — অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্যের ভিত্তিতে।**

করলেন। যখন চাষের কাজ কম, তখন চাষিরা যে অন্য কোথাও কাজের খোঁজে যাবে বা গ্রাম ছেড়ে দূরের মেলায় যাবে তাও হবে না। ফেরিওয়ালা, ভিখারি, ভবঘুরে, গায়ক, ফকির-দরবেশ, যাদের মাধ্যমে অন্য অঞ্চলের খবর পাওয়া যেত তারাও আর আসে না। যাতায়াতের বাধা-নিষেধ এবং সমবায়ে শস্য উৎপাদনে বাড়তি জোর পড়ায় চীনা কৃষক-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে কাঠ-খোদাইয়ের কাজ ও সূচীশিল্পের যেসব হস্তশিল্প ছিল তাও খুব কমে যেতে লাগল। গ্রামীণ চীনের সমস্তরকম ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষুদ্রশিল্প শুকিয়ে মরায় সমস্ত বিষয়ে কৃষকরা রাষ্ট্রীয় সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। শহুরে সর্বহারাদের অগ্রাধিকার দেওয়ায় তারাই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সব সুযোগগুলো পেতে থাকল। ওদিকে চিরাচরিত জড়িবুটি ওষুধগুলোকে ও টোটকা ডাক্তারকে বেআইনি ঘোষণা করায় কৃষকরা পড়ল অসুবিধায়। তাদের অসুখ সারানোর জন্য ওসব নেই, আধুনিক চিকিৎসক ও ওষুধ কোনটাই আর তাদের আয়ত্বে নেই ...।

যৌথ খামারের পশুগুলোকে নিয়ে যাওয়ার আগেই কৃষকেরা নিজেদের পশুগুলোকে মেরে মাংস খেতে লাগল। সমবায়ের লোকেরা পশু বাজেয়াপ্ত করতে আসার আগেই তারা মাংস বিক্রি করে দিতে লাগল। আনহুই প্রদেশের ফেনঈয়াং গ্রামের তথ্য বলছে, সমবায় কৃষককে একটা ষাঁড়ের জন্য ৫.৫ ইউয়ান দিচ্ছে, কিন্তু কৃষক একটা ষাঁড়ের মাংস বেচলে পাচ্ছে ৩০ থেকে ৪০ ইউয়ান। যেহেতু পশুগুলো এখন যৌথ সম্পত্তি, কেউই তাদের দেখভাল করছে না। তারা পশুগুলোকে মরণপণ খাটাচ্ছে এবং তাদেরকে দেওয়া খাদ্যদ্রব্যগুলো নিয়ে গিয়ে নিজের পোষা শুয়োরগুলোকে খাওয়াচ্ছে। ১৯৫৬-র শরতে এইভাবে ২১০০ পশু মারা যায়। প্রথম তুষারপাতের পরে আরও ৪৪০টা পশু মারা যায়। ... হেবেই প্রদেশে ১৯৫৬ সালে মোট কৃষিকাজে ব্যবহৃত ও ভারবাহী পশুর সংখ্যা ৪৩ লক্ষ থেকে কমে হয় ৩৩ লক্ষ। পরের বছর হেনানের প্রথম পার্টি সেক্রেটারি পান ফুশাং রিপোর্ট করেছিলেন যে মহিলারা বাধ্য হয়ে জোয়াল কাঁধে মাঠে চাষ করছে, তাদের পেট মাটিতে ঠেকে গেছে, তবু করতেই হচ্ছে, গবাদি পশুর এতখানি অভাব।"

আমাদের অস্ট্রেলিয় লেখকদ্বয় বলছেন, "সমবায়ে যুক্ত চাষিদের অল্পস্বল্প নিজস্ব জমি রাখতে দেওয়া হত, সেখানে উৎপন্ন দ্রব্যাদি তারা খোলাবাজারে বিক্রি করতে পারত এবং কো-অপারেটিভ থেকে মোট যা আয় হত, তার থেকে চাষিরা তাদের 'শ্রম পয়েন্ট' (অর্থাৎ কতটা খেটেছে তার পরিমাপ) অনুসারে নিজের প্রাপ্য অংশ পেত। এক্ষেত্রে কী পরিমাণে এবং কেমন মানের কাজ করেছে তা দেখা হত।"

সব মিলিয়ে তাদের মতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে বার্ষিক বাজেটের খুব অল্প অর্থাৎ ০.২ অংশ নিয়োজিত হলেও সমবায় প্রথার কারণেই মাথা পিছু আয় এই পাঁচ বছরে অল্প হলেও বেড়েছিল। যদিও এর পরপরই তাঁরা লিখেছেন, "১৯৫৩-৫৪ সালে যেখানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শস্য কিনে ও খাজনা হিসেবে সংগ্রহ করে শস্যের পরিমাণ ছিল মোট ২৯.১ শতাংশ, ১৯৫৬-৫৭ সালে তা হয়ে দাঁড়াল ২৫.১ শতাংশ। এটাই মাওকে, শিল্প-বৃদ্ধির সমস্যা দূর করার জন্য তিনটে পদক্ষেপের দিকে ঠেলে দিল : ১৯৫৫-৫৬ সালে দ্রুত বড়ো সমবায় গড়ে তোলা, ১৯৫৮-তে কৃষি কমিউন গড়া এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে শিল্পে 'গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড'কে উৎসাহিত করা।"

কিন্তু মাওয়ের চিন্তার সঙ্গে জুসপার বেকারের বিরোধী বক্তব্যকে জুড়ে পড়লে একটা অন্য চিত্রও আবছাভাবে নজরে আসে। প্রথমত, দারিদ্র ও অভাবের ঐতিহাসিক পটভূমি লুপ্ত হয়নি; দ্বিতীয়ত, যৌথচাষের সরঞ্জাম ও ভারবাহী পশুর টানাটানি রয়েছে; তৃতীয়ত, সার্বিক যেটুকু উন্নতি হয়েছে, তাকে চাষিদের ওপরের দিকের একাংশ ব্যক্তিগত বা পরিবারগত আরও স্বচ্ছলতার জন্য কাজে লাগাতে চাইছে। পার্টি, বিশেষত মাওয়ের মতো নেতারা, সেই উন্নতির প্রাথমিক ভিত্তিটাকে সমষ্টিগত সমৃদ্ধির দিকে ঠেলে তুলতে চাইছেন। তাই 'লাফিয়ে হই পার'!

সামনের দিকে লম্বা লাফ : কমিউন গড়ে ওঠা

১৯৫৮ সালে 'গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড' বা 'সামনের দিকে লম্বা লাফ' শুরু হল কমিউন গড়ে তোলা ও 'দুপায়ে চলা'র শিল্পনীতির মাধ্যমে। এই দু'পায়ে চলার শিল্পনীতির মানে একই সাথে মাঝারি, ছোটো ও বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলা এবং দেশীয় প্রযুক্তি ও আধুনিক পদ্ধতি কাজে লাগানো।

কমিউন গড়ে তোলা যদি কৃষিক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের ফসল ধরা হয়, তাহলে এর আগের কো-অপারেটিভগুলো ছিল তার বীজ। এগুলো শুধুমাত্র একটা প্রশাসনিক সংগঠন বা শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের পদ্ধতি (শুধু বড়ো বড়ো শহরে শিল্প না গড়ে, কাঁচামালের উৎসস্থল এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাজার হিসেবে গ্রামে গ্রামে শিল্প গড়ে তোলার প্রয়াস হিসেবে) ভাবা হয়নি। ভাবা হয়েছিল, একসঙ্গে শ্রম করা, একসঙ্গে বাঁচার একটা নতুন জীবন হিসেবে। এর সাথে সাথে গ্রামের শ্রম বিভাজনের উন্নতির উপায় হিসেবেও কমিউনকে ধরা হয়েছিল।

সেচের খাল কাটা ও জলাধার বানানোর কাজে বৃহদাকারে সহযোগিতামূলক কাজ করতে গিয়ে সমবায় প্রথায় কাজ করার সুবিধা ১৯৫৭-তেই বোঝা গিয়েছিল। তখনই বেশ কিছু কো-অপারেটিভ জুড়ে ছোটো ছোটো কমিউন বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে তোলা হচ্ছিল। ১৯৫৮-র সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭,৫০,০০০ কৃষি সমবায় জুড়ে ২৩,৩৮৪টি কমিউন গড়ে তোলা হল, যার মধ্যে ৯০ শতাংশ চাষি-পরিবারই ঢুকে গেল। নানা মাপের এক একটা কমিউনে পাঁচ হাজার থেকে এক লক্ষ মানুষ। পরে অবশ্য এত বড়ো বড়ো কমিউন পরিচালনার সমস্যা দেখা দেওয়ায় কমিউনগুলোর আকার ছোটো করে মোট ৭০ হাজার কমিউন গড়া হয়। এগুলো শুধু উৎপাদনের সংস্থাই নয়, সরকারি সংস্থাও বটে — স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্বও কমিউনের। কতকগুলো কমিউন আবার খুব আগুয়ান কিছু কার্যনীতি গ্রহণ করল — যেমন ব্যক্তিগত জমি একদম তুলে দেওয়া, বিনামূল্যে দ্রব্য সরবরাহ করা; কোথাও কোথাও সাধারণ মানুষ রেশনে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে থাকল, কোনরকম কাজ করুক আর না করুক। যদিও এইসব আগুয়ান নীতি বেশিদিন চালু থাকল না।

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসে লেখা হচ্ছে, "চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি হেবেই প্রদেশের বেইদেইহে-তে পলিটব্যুরো মিটিংয়ে বসে (১৭-৩০ আগস্ট ১৯৫৮)। ... এতে বলা হয়, "সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা ও সাম্যবাদে পৌঁছনোর শ্রেষ্ঠ সংগঠন হচ্ছে জনগণের কমিউন এবং চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর খুব দূরের ভবিষ্যৎ নয়।" এই মিটিংয়ের পরে দেশজুড়ে অভ্যুত্থানের মতো গণকমিউন গড়ে তোলা ও ইস্পাত বানানোর ধূম পড়ে যায়।

কমিউন গড়ে ওঠার সাথে সাথে জমির মালিকানা নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দিল। প্রশ্ন উঠে গেল যে গ্রাম, নাকি উৎপাদন-টিম, নাকি কমিউন কার হাতে হিসাব রাখা, পরিকল্পনা করা ও আয় বন্টনের মূল দায়িত্ব থাকবে। ১৯৫৮ সাল শেষ হতে হতেই চাষিরা তাদের সম্পত্তি অর্থাৎ চাষের যন্ত্রপাতি ও গবাদি পশু কমিউনের হাতে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রথম দিকে ছোটো ছোটো ব্যক্তিগত জোতগুলোর দিকে কমিউন হাত বাড়ায়নি। পরে ওটা করা হলেও ১৯৫৯ সালে গ্রামের মোট উৎপাদনের ২০ শতাংশ আসত ব্যক্তিগত ছোটো জোতগুলো থেকে। কমিউন সম্পর্কিত তথ্য যে বই থেকে দিচ্ছি সেই 'দ্য চাইনিজ রোড টু সোস্যালিজম'-এর লেখকদ্বয় জানাচ্ছেন, ১৯৬৬-৬৮ পর্যায়ে চীন পরিদর্শনের সময় তাঁরা দেখেছেন, মোট উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ ওইরকম ছোটো ব্যক্তিগত জোত থেকে আসছে।

প্রথমদিকে, জমি ও অন্যান্য পুঁজি সহ সব প্রধান সম্পত্তি এবং উৎপাদনের মালিকানা ছিল কমিউনের হাতে — উৎপাদন-টিম, উৎপাদক-বাহিনী (ব্রিগেড) বা জেলা প্রশাসনের হাতে নয়। সমস্যা শুরু হয় যেখানে সম্পন্ন ও দক্ষ কো-অপারেটিভগুলোর সাথে অসম্পন্ন, অসমর্থ কো-অপারেটিভগুলোর সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল সেখান থেকে; বিশেষত যে কমিউনগুলোয় সমতার ভিত্তিতে মজুরি চালু করা হয়েছিল, অর্থাৎ যেখানে কে কতটা ফসল ফলাচ্ছে, কেমন তার মান — এসবের বদলে শ্রমই মজুরির সাধারণ মাপকাঠির হিসেবে ধরা হয়েহিল, সেখানে কতগুলি বাস্তব সমস্যা দেখা দিল। কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে নিয়ে আসা সমাজতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কতগুলি সংঘাতও দেখা দিল। ১৯৫৮-র ডিসেম্বরে উচাং-এ কম্যুনিস্ট পার্টির অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ প্লেনারি সেশনে প্রস্তাব নেওয়া হ'ল, যে যার প্রয়োজন অনুযায়ী নয়, পাবে কাজ অনুযায়ী। আর হিসেব রাখার দায়িত্ব দেওয়া হল উৎপাদক-বাহিনী (ব্রিগেড)-এর হাতে। এই প্রস্তাব সিদ্ধান্তের রূপ পায় ১৯৫৯-এর আগস্টে লুশানে পার্টির বর্ধিত পলিটিকাল ব্যুরোর মিটিংয়ে। এর থেকে অনেকেই সিদ্ধান্ত টানে যে এরপর থেকে আর কমিউন ছিল না, যা ছিল তা নামেই কমিউন। কিন্তু আমাদের অস্ট্রেলিয় লেখকদ্বয় তা মনে করেন না। তাঁদের মতে এই সংস্কার করা হয়েছিল, বেশি বাড়াবাড়ি করে যে কমিউনগুলো বিনা খরচায় সরবরাহ ও কেন্দ্রীকরণ করছিল, শুধু তাদের জন্য। শিল্পসংস্থাগুলোর মালিকানা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে সম্পর্কের ওপর নিয়ন্ত্রণ কমিউনের হাতেই ছিল। ১৯৬৮-তেও তাঁরা দেখেছেন কোনও কোনও জায়গায় কমিউনের হাতে হিসেবের দায়িত্ব থাকলেও মূলত বেশি জায়গায় উৎপাদক-বাহিনী (ব্রিগেড) হিসাব-পত্র রাখত। এই তফাৎ হয়েছিল দুটো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে — অর্থনীতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও কমিউন সদস্যদের রাজনৈতিক সচেতনতা।

কো-অপারেটিভের মতো, কিন্তু তার থেকে আরও বড়ো আকারে কমিউন বিলম্বিত মজুরি অথবা মজুরিবিহীন যৌথশ্রমের ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে পারে, যদি নৈতিক উৎসাহদান (মরাল ইনসেনটিভ) যথাযথ হয়। যেখানে জমিতে নানারকম ফসল ফলানো যায়, সেখানে যদি বিভিন্নরকম শস্যের ওপর বিভিন্ন মূল্যের কর থাকার জন্য কমিউনের আয় কমে যায়, তাহলে নানারকম শস্য না ফলিয়ে কমিউন দুটো ফসল চাষের মাঝের সময়ে অন্য কাজে সদস্যদের লাগিয়ে যতটা পারা যায় আয় বাড়িয়ে নেয়। বাস্তবে এই পদ্ধতি নানারকম ফসল ফলানোর স্বাধীনতাকে খর্ব করে।

এই ধরনের অবৈতনিক শ্রমকে কমিউন তার সুবিধামতো চাষের কাজে না লাগিয়ে, সেচের কাজ বা জলাধার বানানোর কাজে লাগাতে পারে। যদি যথেষ্ট পরিদর্শন, সাবধানতা ও উৎসাহদানের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এমন প্রকৃত পুঁজি সৃষ্টি করা যায় যেখানে খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের সরবরাহের ওপর কোনরকম অর্থমজুরির চাপ পড়ে না।

এগুলো শুধু অর্থনীতির তত্ত্ব নয়, বাস্তবে এর প্রচণ্ড প্রয়োগ দেখা গেছে চীনে। যেমন, ১৯৫৭-র অক্টোবর থেকে ১৯৫৮-র শরতের মধ্যে ৫৮০০ কোটি ঘন মিটার মাটি ও পাথর কাটা হয়েছিল, যা কিনা ৩০০টা পানামা খাল কাটার সমান। একটা পানামা খাল কাটতে দশ বছর সময় লেগেছিল। যদিও এই প্রবল শ্রম সব জায়গায় ভালোভাবে ব্যবহার করা গিয়েছিল এমন নয়। কখনও বড়ো বড়ো বাঁধ দিয়েও জলাধার থেকে খেতে জল নিয়ে যাওয়ার সুব্যবস্থা নেওয়া যায়নি, কখনও জল ঢোকানোর প্রচুর খালের ব্যবস্থা করলেও নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক মতো হয়নি। তবু সব মিলিয়ে ১৯৫৮-৬০ এই তিনবছরে আরও এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ মউ জমি সেচের আওতায় আনা গিয়েছিল। আর কী লাভ হয়েছিল কমিউন গড়ে? ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৮-তে ৩০ শতাংশ বেশি শস্য উৎপাদন হয়েছিল, যদিও প্রথমে ভাবা হয়েছিল যে একবছরে শস্য উৎপাদন দ্বিগুণ হবে।

এখানে দেখা যাচ্ছে, সর্বত্র ও সবসময়ে যেমন হয়েছে, তেমন ভাবেই মূলত উৎপাদন বৃদ্ধিকে প্রতিটা বছরের উন্নয়নের মাপকাঠি ধরা হচ্ছে। উৎপাদন বাড়ানোর ঝোঁক ১৯৫৮ সালে কেমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তার খানিকটা বোঝা যায় ব্যাপক সেচব্যবস্থার বর্ণনায়। 'মডার্ন চায়না'জ ইকনমি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট' বইতে লিখছে, "কয়েক কোটি চাষি পাহাড়ে চলে গিয়েছিল লোহা ও ইস্পাত বানাতে অথবা শহরে শিল্পাঞ্চলে কাজ করতে। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন দারুণ মার খেয়েছিল।" পাশাপাশি উৎপাদন-মাত্রাকে বাড়িয়ে বলা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ১৯৫৯-এর এপ্রিলে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব লিও শাও চি-র ওপর ন্যস্ত করার পরেই ২৯ এপ্রিল মাও অন্তর্দলীয় পত্রে পার্টির একদম নিচু স্তর অবধি নির্দেশ পাঠালেন, "উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার সময় যতটুকু পারবেন ততটুকুই বলবেন, ঠিক কী পরিমাণ চাষ করেছেন সেটা জানান। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কী কী পদ্ধতি নিয়েছেন, 'কৃষির আট পদ্ধতি' গ্রহণ করেছেন কি না সে ব্যাপারে মিথ্যে বলা উচিত নয়। ওপরতলার চাপাচাপিতে প্রচুর মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। ওপরতলার কর্মীরা যদি অহঙ্কারী হয়, তলার কর্মীদের ওপর চাপ দেয় এবং বড়ো বড়ো প্রতিজ্ঞার বাত দেয়, তাহলে নিচের তলার কর্মীরা খুব অসুবিধার মধ্যে পড়বে।"

'কৃষির আট পদ্ধতি' ছিল উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে আটটি বিষয়ে জোর দেওয়া : জল সংরক্ষণ, সার, চাষের জমির উন্নয়ন, ভালো বীজ বপন, নিবিড় চাষ, পোকামাকড় ও অসুখের হাত থেকে ফসল বাঁচানো, কৃষিযন্ত্রের উন্নয়ন ও চাষের জমির পরিকল্পিত ব্যবহার। এখানে আমরা 'হাংরি ঘোস্টস্' থেকে বিরোধী বক্তব্য খানিক শুনতে পারি। এই লেখকের মতে, "মাওয়ের নির্দেশে চাষিরা গভীর ভাবে চাষ করেছে, ৩ ফুট গভীরতার জায়গায় ১০ ফুট এবং তার ফলে ০.১৭ একরে অবিশ্বাস্য ৬৫ টন ফসল ফলেছে; ৬০ কেজি ওজনের যেসব কুমড়োর তখন ছবি ছাপা হয়েছে, তার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ আছে; চাষের বীজ ঘনভাবে বোনার যে তথ্য দেওয়া হয়েছে ২.৫ একরে ১৫ লক্ষের বদলে ১ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ, তা মিথ্যা। চাষিরা তা করেনি; মাও সেতুং ওই সময়ে সিনলি পরিদর্শনে এলে, তাঁকে যে খেত দেখানো হবে সেখানে অন্য খেত থেকে চারা তুলে এনে সাময়িকভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়; ৯০ শতাংশ মাটিতে ১০ শতাংশ গোবর সার মিশিয়ে যে সার বানানো হয়েছিল তা তেমন উন্নত কিছু নয়; কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে রাশিয়ার অনুকরণে বড়ো বড়ো ট্রাক্টর বানানো হয়, যার লাঙলের দু'ধারে ফাল। কিন্তু দক্ষিণ চীনে ও পাহাড়ি অঞ্চলে তা কাজে না লাগায় ৭০,০০০ ট্রাক্টর নষ্ট করা হয়। পরে ১৯৮০ সালে ছোটো ট্রাক্টরের ব্যবহার চাষের উন্নতি ঘটায়; মোট জমির তিনভাগের একভাগ চাষের জন্য রেখে বাকিটা চারণভূমি, বনসৃজন, পুষ্করিণী ইত্যাদির জন্য রাখতে বলা হলেও এটা সব প্রদেশ মেনে নেয়নি; চড়াইপাখি, ইঁদুর, পোকা ও মাছ — ফসলের এই চার শত্রু মারতে দিয়ে চড়াইপাখি নির্বংশ হয়েছে ও পোকার উৎপাত বেড়ে গেছে; বড়ো বড়ো সেচের বাঁধ (এটাও রাশিয়ার নকল) প্রচুর মানুষকে উৎখাত করেছে — যেমন, ঝেজিয়াং প্রদেশে সিয়ানজান জলাধার তৈরি করতে তিন লক্ষ মানুষকে সরাতে হয়েছে এবং এক চুন আন গ্রামাঞ্চল থেকেই এক লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার মানুষকে উৎখাত করা হয়েছে।"

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, চীনা গ্রামসমাজের বাস্তবতা এবং সমাজতন্ত্রের চিন্তা — এই দুইয়ের মাঝে কমিউনকে কেন্দ্র করে যে বিরোধ, তারই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে চাষিদের এবং পার্টির কর্মীদের 'মিথ্যাচার' বা 'বাড়িয়ে বলা'-র প্রবণতার মধ্য দিয়ে। মাও বা জেসপার বেকার তাঁদের লেখায় এর স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সংকটের সময়

এরপর এল অর্থনৈতিক সংকটের পর্ব। সংকটের সময়ের বর্ণনায় জেসপার বেকার লিখছেন, "চীনে যেখানে সবার জন্য যথেষ্ট খাদ্য কখনও এর আগে পাওয়া যায়নি, সেখানে লোকে এত খেল যে ১৯৫৮–৫৯ সালের শীতের সময়ে শস্যভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেল। এই বেশি খাওয়ার বিষয়ে সমর্থন পাওয়া যায় উইলিয়াম হিন্টনের 'শেনফ্যান' বইয়ের ২১৮ পাতায়, 'উই দে বলল, 'আমরা প্রচুর মাংস খেয়েছি। বেশি মাংস খাওয়া মানে বিপ্লবী হওয়া এমনটাই মনে করা হচ্ছিল।' যাই হোক, কোনও কোনও জায়গায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চাষিরা মিষ্টি আলুর চাষ করে রাখলেও অন্যদের বিশ্বাস ছিল শহরের লোকের মতো তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় শস্যভাণ্ডার খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু মাও ভাবলেন, চাষিরা (রাশিয়ার কুলাকদের মতো) শস্য লুকিয়ে রাখছে। ১৯৫৮ থেকে তিন বছরের মধ্যে চীন শস্য রপ্তানি দ্বিগুণ করেছে, আমদানি কমিয়ে দিয়েছে, রাশিয়ায় রপ্তানি দেড়া করা হয়েছে এবং উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম এবং আলবেনিয়াকে শস্য উপহার দিয়েছে। ওদিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। কারণ মাওয়ের মতে জনসংখ্যা বেশি থাকা ভালো, 'প্রতিটা পেটের সাথে দুটো করে হাতও জন্মলাভ করে'।

... ১৯৫৮–র শরতে বিশাল কৃষি ফসলের সবটা কৃষকরা সংগ্রহও করেনি। এদের অনেকেই ব্যস্ত ছিল ইস্পাত তৈরি করতে বা জলাধার বানাতে। অনেক জায়গায় তারা নিজেদের কাস্তে গলিয়েও ইস্পাত তৈরি করেছে আর মাঠের ফসল মাঠেই পচেছে। আরও বিপজ্জনক হল, অফিসাররা বেশি বেশি শস্য সংগ্রহ করতে থাকল, কারণ ফলন সেবার বেশি হয়েছে। যেহেতু কমিউন গড়ে তোলা হয়েছে, তাই ফসল উঠছে কমিউনের গোলায়, কৃষকের গোলায় নয়। যেসব সদস্যরা রেকর্ড শস্য উৎপাদনের খবর দিয়েছে, তাদের তখন রেকর্ড শস্য সংগ্রহ করে রাষ্ট্রকে পাঠানো ছাড়া উপায় নেই।

১৯৫৯–এর বসন্তে (পরবর্তীকালে বো ইয়ো বো–র লেখা থেকে পাওয়া যায়) আড়াই কোটি লোক উপবাসে কাটাচ্ছিল। প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল পেং তে হুই, একমাত্র প্রবীণ নেতা, যিনি ১৯৫৮–র শরতে বেজিং–এ টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, 'জনগণ অনাহারের বিপদে পড়েছে।' ১৯৫৯–এর ৩০ জুলাই পলিটব্যুরোর মিটিংয়ে (লুশান সম্মেলন) মাও সেতুং সামান্য আত্মসমালোচনা করেন, কিন্তু 'গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড'–এর ছোটো খাটো ভুলগুলো সম্পর্কে বলেন, 'অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কিছু টিউশন ফি তো খরচ হবেই।' লিও শাও চি ও চৌ এন লাই চুপ করে থাকেন। পেং মাওকে সমালোচনা করে 'দক্ষিণপন্থী' হিসেবে চিহ্নিত হন। ওই বছরই সেপ্টেম্বরে পার্টি বিরোধী চক্রান্তের জন্য পেং সহ আরও তিনজন নেতাকে দায়ী করা হয়। এক মাস পরে পেং আত্মসমালোচনা করে মাওকে চিঠি পাঠান। তাঁকে বেজিং–এর বাইরে একটা গ্রামে গৃহবন্দী করে রাখা হয় — সেখানে তিনি সবজি চাষ করতেন। পরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তাঁকে বন্দী করা হয় ও অত্যাচার চালিয়ে তাঁকে মেরে ফেলা হয়।

১৯৫৯–এর শেষে 'পিপল্‌স্ ডেইলি'তে এক লেখার প্রস্তাব রাখা হয়, 'চাষিদের অবশ্যই আর্থিক ব্যবস্থার কড়াকড়ি করা উচিত, যতটা পারা যায় মিতব্যয়িতা করা উচিত। দু'বারের বেশি দিনে খাওয়া উচিত না, যার মধ্যে একটা আহার হালকা ও তরল হওয়া উচিত।' মাও সেই সময় নিজে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন।

১৯৬০–এর জুলাইয়ে ১৫,০০০–এর মতো সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ হঠাৎ একসাথে চীন ছেড়ে চলে যায়। চীনও চেয়েছিল ওরা তাড়াতাড়ি চলে যাক, যাতে দুর্ভিক্ষের খবর ক্রুশ্চেভের কানে না ওঠে। ১৯৬০–এর গোড়া থেকে 'পিপলস্ ডেইলি' ও দ্বিমাসিক 'রেডফ্ল্যাগ' পত্রিকা ছাড়া সব পত্রিকা দেশের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ট্রেন ও প্লেন চলাচল অর্ধেক হয়ে গেল জ্বালানির অভাবে।

১৯৫৯–এর সেপ্টেম্বরে 'রেডফ্ল্যাগ' পত্রিকায় মাও লিখেছিলেন যে ১৯৫৮–র থেকেও ১৯৫৯–এ বেশি ভালো ফল দেখা যাবে। ১৯৬০–এর প্রথম সংখ্যাতেও তিনি আবার লিখলেন, 'যদিও সাংঘাতিক খরা হয়েছে তবু কমিউনগুলো এখনও সম্পন্ন এবং জনগণ যথেষ্ট সুখী'। চাষিরা ভেবেছিল বেশি খেটে কী হবে (গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড অর্থাৎ ১৯৫৮–৫৯–এর আগে বেশি খেটে লাভ হত)। এখন জমির যত্ন নিলেই বা কী, পশুদের লালন করেই বা কী, শ্রমের ফসল সবই তো নিয়ে নেওয়া হবে।

১৯৫৯ সালের শরতে শস্যের চাষ ১৯৫৮–র তুলনায় ৩ কোটি টন কম হল। কিন্তু সরকারি হিসেবে তা অনেক বাড়িয়ে দেখানো হল (এই হিসেবের মধ্যে মিষ্টি আলুর উৎপাদন ধরে নেওয়া হয়েছিল। আসলে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে আরও কম।) ওদিকে রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে শস্য সংগ্রহ হল মোটের ওপর ৪০ শতাংশ। এর থেকে বেশি আগে হয়নি। কোনও কোনও জায়গায় পুরো চাষের ফসল নিয়ে নেওয়া হয়েছে ... ১৯৫৯–এ চাষিরা উপবাসে মরতে শুরু করে। তবে সবচেয়ে বেশি মারা যায় ১৯৬০–এর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে।

... যাই হোক না কেন, দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সেনা নামানো হয় ১৯৬১–র গোড়ায় মাওয়ের গোপন বাহিনী গ্রাম ঘুরে আসার পর। পিপল্‌স লিবারেশন আর্মির ৩০,০০০ সেনাকে নির্দেশ দেওয়া হয় মিনঈয়াং দখল করতে, রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে শস্য বিতরণ করতে এবং যেসব নেতারা দায়িত্বে ছিল তাদের গ্রেপ্তার করতে। ওখানে সৈন্যরা তিন থেকে চার মাস ছিল। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর মন্তব্য, 'যে জিনইয়াং প্রথম কমিউন গড়ে চীনকে গর্বিত করেছিল, তার হুয়াং চুয়ান গ্রামে মানুষগুলো এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে হামাগুড়ি দিয়ে ত্রাণের শস্য নিতে যাচ্ছিল। কয়েকজন ত্রাণের কাছে পৌঁছনোর কয়েক ফুটের মধ্যে পড়ে মরে গেছে। সৈন্যরা ১১ লক্ষ ৭০ হাজার শীতবস্ত্র ও ১ লক্ষ ৪০ হাজার লেপ বিলিয়েছিল এবং অন্যান্য দরকারি জিনিস জুগিয়েছিল। জিনইয়াং–এর কোনও কোনও জায়গায় ১০টার মধ্যে ৯টা ঘরের কৃষকই পালিয়ে গিয়েছিল, সৈন্যরা পাঁচ লক্ষেরও বেশি ঘর সারিয়েছিল, ৮০,০০০ সরকারি বাড়িতে চাষিদের আশ্রয় শিবির খুলেছিল এবং এমন আদেশ জারি করা হয়েছিল যে 'কোনও চাষিকে যেন কেউ অর্ধদিবসের বেশি কাজ করতে না বলে।'

মাও নিজে এই সৈন্যবাহিনী পাঠানোকে মঞ্জুর করেন এবং এই সংক্রান্ত চিঠি পার্টি লেভেলে ছড়াতে বলেও বলেন, 'আমাকে হয়ত দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিগ্রস্ত বলা হতে পারে, কিন্তু কোনও উপায় নেই'। প্রোডাকশন ব্রিগেডের লোকেরা চাষিদের মারধোর করে গোপন শস্য বের করার বিষয়ে এর আগেও কিন্তু তিনি বলেছেন, 'এগুলো বাড়াবড়ি হয়ে যাচ্ছে'। — (এগুলো সব পার্টির অপ্রকাশিত দলিলে রয়েছে।)

দিং সু–র 'রেন হুয়া' ও সু লুওঝেং–এর 'জুলাই স্টর্ম' বইতে বলা হয়েছে জিনইয়াং–এ মৃত্যুর সংখ্যা ১০ লক্ষ এবং গোটা প্রদেশে ২০ লক্ষ। মাওয়ের মতে — এটা প্রতিবিপ্লবীদের কাজ। সরকারি একটা মতে হেনান প্রদেশে এক লক্ষ তিরিশ হাজার কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের কাজের ধারা পাল্টাতে বলা হয়। এর মধ্যে চার হাজারের কাজ 'মারাত্মক ভুল' হিসেবে ধরা হয়, ন'শ তিরাশি জনকে পদচ্যুত করা হয়, দুশ' পঁচাত্তর জনকে গ্রেপ্তার করে বিচার করা হয় — এদের মধ্যে পঞ্চাশ জন সিনিয়র ক্যাডার। জিনইয়াং–এর পার্টি সেক্রেটারি লু জিয়ানওয়েন সহ বেশ কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও মাও তা রদ করেন। এদের পরে অন্যান্য অঞ্চলে নানা পদে বহাল করা হয়।"

কিন্তু বেকারের এই দীর্ঘ লেখায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা সেরকমভাবে বলা হয়নি। অথচ অন্যান্য সব সূত্র সেরকমই বলছে। সব সূত্রেই তার উল্লেখ

রয়েছে। যেমন অস্ট্রেলিয়রা লিখছেন, "পরপর তিনটে বছর খুব খারাপ গিয়েছিল। ১৯৫৯ সালে অর্ধেকের মতো চাষের জমি হয় বন্যা বা খরায় আক্রান্ত হয়। ১৯৬০ সালে একই সাথে ঝড়, বন্যা ও পোকামাকড়ের আক্রমণে অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ আশি কোটি মউ জমির ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং আরও তিরিশ থেকে ছত্রিশ কোটি মউ জমিতে কোনও চাষই হতে পারেনি। শানতুং-এ ইয়েলো নদীতে এক মাস ধরে কোনও জলই ছিল না, যা কোনদিনই কেউ শোনেনি। খাদ্যশস্যের সাংঘাতিক রকম অনটন দেখা দেয়, কিন্তু সকলের চেষ্টায় ও রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ এড়ানো যায়। কমিউন সংগঠনগুলো অনেক মানুষকে এক জায়গায় করার ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এই কঠিন সময়েও দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে পেরেছিল।"

এডগার স্নো (একমাত্র আমেরিকান) ১৯৬০ সালে 'দি আদার সাইড অফ দি রিভার : রেড চায়না টুডে'-তে লিখেছেন — তিনি ইনার মঙ্গোলিয়া থেকে শুরু করে সিচুয়ান প্রদেশের চংকুইং পর্যন্ত চীনের নানা জায়গা ঘুরেও কোনও দুর্ভিক্ষ দেখতে পাননি। তাঁর বক্তব্য, "১৯৫৯-৬২ সালে পশ্চিমি অনেক কাগজ 'চীনের গণ-অনাহার' নিয়ে অনেক কিছু বললেও কোনও সহায়ক তথ্য দিতে পারেনি। আমি যতদূর জানি কোনও অকম্যুনিস্ট পরিদর্শক নেই যিনি এই সময় চীনে ঘুরেছেন এবং দুর্ভিক্ষের কোনও প্রামাণ্য উদাহরণ দিয়েছেন।

আমি জোর দিয়ে বলতে পারি আমি চীনে কোনও অনশনক্লিষ্ট মানুষকে দেখিনি, পুরনো-কালের দুর্ভিক্ষের মতো কিছু আমার চোখে পড়েনি (শেনইয়াং-এ বানভাসীদের উদ্বাস্তু শিবিরে একজন ভিখারীকে ছাড়া)। ... রেশনিং ব্যবস্থার অবহেলা বা অদক্ষতার জন্য বিচ্ছিন্ন উপবাসের ঘটনা কোথাও ঘটে থাকতে পারে। যথেষ্ট পরিমাণ অপুষ্টি নিঃসন্দেহে আছে বলা যায়। গণ-অনাহার? না।"

১৯৬০ সালে এডগার স্নো ছাড়া, ফেলিক্স গ্রীনও দুর্ভিক্ষ দেখতে পাননি। অ্যানা লুই স্ট্রং লিখেছেন, "এমন ভয়ানক খরা হয়েছিল, যে ইয়েলো নদী হেঁটে পেরোচ্ছিল বাচ্চারা। কিন্তু কমিউনগুলো দুর্ভিক্ষ থেকে দেশকে বাঁচিয়েছিল।" ফেলিক্স গ্রীন বলেছেন, "খাদ্য সংকটের কথা রয়টারের পিকিং ব্যুরো বলছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ কখনও বলেনি।"

তাহলে কোনটা ঠিক? দুর্ভিক্ষে কয়েক কোটি লোকের মৃত্যু না খাদ্য সঙ্কট? এখানে আমরা আমাদের কাছাকাছি কিছু অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখতে পারি — সেটা বেলপাহাড়ি, আমলাশোল — অপুষ্টির পেছনে যে আহারের অভাব থাকে তা সবাই জানে। কাজেই কোনও কমিউন বা রেশনিং ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে অনাহারকে বন্টন করে দিলেও অর্থনৈতিক সংকটের পোষাকের তলায় দুর্ভিক্ষের উলঙ্গ চেহারা থাকতেই পারে।

এই প্রসঙ্গে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নিজস্ব দলিল থেকে দুটো অংশ উদ্ধৃত করে শেষ করব :

"২৮ মে ১৯৬০ : চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি 'জাহাজে করে খাদ্যশস্য পাঠানোর এক জরুরি নির্দেশ' দেয়। তাতে বলা হয়, 'বেজিং, তিয়ানজিন, সাংহাই ও লিয়াওনিং প্রদেশে গত দু'মাস ধরে প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্যশস্য পাঠানো হচ্ছে এবং এখন ওই প্রদেশগুলোতে খাদ্যশস্যের ভাঁড়ার প্রায় শূন্য। শীঘ্রই এখানে আরও খাদ্যশস্য না পাঠালে অবস্থা আরও খারাপ হবে।' ... এরকম জরুরি ভিত্তিতে খাদশস্য পাঠানোর সাথে সাথে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আরও কতগুলো জরুরি পদক্ষেপ নেয় — সেগুলো হল, রেশনে নাগরিকদের জামা-কাপড়ের কোটা কমিয়ে দেওয়া, শহর ও গ্রাম সব জায়গায় রেশনে প্রাপ্য খাদ্যশস্য ও ভোজ্য তেলের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া, খাদ্যের পরিপূরক সংগ্রহ ও উৎপাদন করা ইত্যাদি।

১ জানুয়ারি ১৯৬১ : হেনান প্রদেশের জিনইয়াং-এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে রিপোর্ট ওখানকার দায়িত্বে থাকা পার্টি কমিটি পাঠিয়েছে, চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তা অনুমোদন করে পাঠিয়েছে। এই রিপোর্টে জিনইয়াং পার্টি কমিটির দায়িত্বশীল অংশ শত্রুর শক্তি বাড়িয়ে দেখেছে; শত্রুদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব এবং জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে গুলিয়ে ফেলেছে এবং খাদ্যশস্যের ভয়ানক অনটন, অনাহারের ছড়িয়ে পড়া, অসুখ ও মৃত্যু এইসবের দায়ই ক্ষমতায় থাকা বদমাইশ লোক ও অন্তর্ঘাতী সামন্ততান্ত্রিক শক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এই রিপোর্টে কাজের ধারা পাল্টানোর জন্য শুদ্ধিকরণ আন্দোলন ও কমিউনকে দৃঢ় ভাবে গড়ে তোলা এবং গরিব ও মাঝারি কৃষকের ওপর নির্ভর করে যে প্রতিক্রিয়ার শক্তি ফিরে আসতে চেয়েছিল তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে একেবারে বিদায় করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রস্তাব সমর্থন করে নির্দেশ দিয়েছে, 'দেশের সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর কমিউন, প্রোডাকশন ব্রিগেড ও প্রোডাকশন টিম সকলেই এই রিপোর্টের আলোকে কমিউনগুলো দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার জন্য নিজেদের কাজের ধারা শোধন করা উচিত।' এই নির্দেশ, আন্দোলনে 'বাম' বিচ্যুতিকে বেড়ে উঠতে উৎসাহিত করেছিল।"

সংকটের ধাক্কা

দুর্ভিক্ষই বলি আর আর্থিক সঙ্কটই বলি, এর ধাক্কাতেই গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড খানিক থমকে গেল। অর্থনৈতিক নীতি পাল্টাতে হল। ১৯৬২-তে দশ দফা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে আবার কৃষিক্ষেত্রে জোর, তারপর হালকা শিল্প ও তারপর ভারি শিল্প এল। ১৯৬২-র জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে গ্রামের কমিউনগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হল ৩০ কোটি ইউয়ান, যেখানে ১৯৫৭-তে মোট বাজেটে খরচ হয়েছিল ৮২.৭ কোটি ইউয়ান। এর মধ্যে ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে শিল্পে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ৪৬ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ২৬ শতাংশ আর আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ ৫৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৪ শতাংশ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'সান জি ই বাও' পদ্ধতি যা কৃষিক্ষেত্রে বাজারের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করল। প্রথমে গ্রামাঞ্চলে ধীরে ধীরে একটা খোলা বাজার তৈরি করা হল। তারপর উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসারে এল — (ক) ব্যক্তিগত জমির পুনরুদ্ধার; (খ) কমিউনের অন্তর্গত পরিবারগুলোকে প্রধান হিসাব রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া; এবং (গ) কমিউনের অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলোর দায়িত্ব রইল নিজেদের উৎপাদন ও লাভের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা।

এর সাথে সাথে একটা কালোবাজারিও চলতে দেওয়া হ'ল। সাংহাইতে ১৯৬১ সালে রান্নার তেলের সরকারি দাম ০.৬১ ইউয়ানে আধ কিলো আর খোলা বাজারে তার দাম তিরিশ ইউয়ান। উৎপাদনে ব্যক্তিগত জমির অবদান প্রচুর বেড়ে গেল। ১৯৬২ সালে ইউনানে ব্যক্তিগত জমির চাষ কমিউনের চাষকে ছাড়িয়ে গেল, ব্যক্তিগত জমির পরিমাণও হয়ে দাঁড়াল মোটের ওপর অর্ধেক। কোয়েহবৌ ও সিচুয়ান প্রদেশে ১৯৬৪ সালে সমবায় প্রথার চাষের চেয়ে ব্যক্তিগত চাষ বেশি হত। সরকারি নীতিতে যেহেতু বাজারের দামের ওপর কোনও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকল না, তাই কৃষিদ্রব্যের খোলাবাজার তৈরি, এমনকি রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোও লাভের হারের দিকে তাকিয়ে পরিচালিত করার জায়গায় চলে এল। কমিউনগুলোতে কৃষকদের চাষের পাশাপাশি অন্য কাজ করার সুযোগ দেওয়া হল — যেমন, শুয়োর পালন বা সবজি চাষের কাজ ইত্যাদি।

হুইলরাইট ও ম্যাকফারলেন তাঁদের চীন পরিদর্শন-কালে (১৯৬৬-১৯৬৮) বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে কথা বলেছিলেন। ১৯৬০-৬৪ সময়কার এক বর্ণনায় তাঁরা শুনেছিলেন : "প্রোডাকশন টিমের চাষিরা বীজ ও শস্য মজুত করে রাখছিল, যাতে বাজারে বিক্রি করে নিজেরা লাভ করতে পারে। তারা তাদের অবসর সময়ে নিজেদের ব্যক্তিগত জমিতে 'সহায়ক উৎপাদন' করত। ব্যক্তির প্রয়োজন ও কমিউনের প্রয়োজনের মধ্যে

ভারসাম্য রাখার চেষ্টায় পার্টি অনবরত ব্যস্ত হয়ে থাকল। পার্টির সব শাখা এই কাজটা ঠিক ভাবে করতে পারছিল না, কারণ আদর্শনৈতিক স্তর নিচে নেমে গিয়েছিল। প্রোডাকশন ব্রিগেডের চাষিরা, নিজেদের কাজ অনুযায়ী ভাগ পেয়ে যাচ্ছিল আর 'জনগণকে সেবা'র বদলে নিজেদের ধনী করে তুলছিল।"

ওঁরা আরও বলেছেন, "ম্যানেজার, প্রযুক্তিবিদ এবং দক্ষিণপন্থী অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকরা শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের জোরালো সমর্থন পেল। ১৯৬০-এর পর অর্থনৈতিক উন্নতি অবশ্যই ঘটেছিল। কিন্তু তার কতটা নয়া অর্থনৈতিক নীতির জন্য বলা কঠিন। আর্থিক উৎসাহদান যে উৎপাদন বাড়িয়েছিল, সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। যদিও শেষ বিচারে এটা মাওবাদী মতে চলছিল না।

... সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একটা উদ্দেশ্য ছিল এইসব অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মাওবাদী পথে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। ... ১৯৬২-র ডিসেম্বরে অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির দশম প্লেনারি সেশন থেকে শুরু করে ১৯৬৪-তে 'তাচাই থেকে শেখো' লেখা পর্যন্ত মাও বরাবরই বাজারি অর্থনীতি এবং কৃষিতে সান জি ই বাও নীতির সমালোচনা করেছিলেন। তখন চীনা বিপ্লবের সরকারি ভাষ্য মাওবাদী হলেও রাষ্ট্র ও পার্টির কর্তৃত্বে ছিল অন্যরা। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৫ কোনটা কোনটাকে পাল্টাবে এই নিয়ে প্রচণ্ড টানাপোড়েনের পর ১৯৬৬-তে শুরু হয়ে গেল সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লব।"

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৬ কমিউনের এই পর্বের টানাপোড়েনকে আমরা তাহলে কীভাবে বিচার করব? একদিকে রয়েছে, ব্যক্তির প্রয়োজন ও সমষ্টির প্রয়োজনের প্রশ্ন; আবার সমষ্টি বলতে যখন কমিউন, তখন তার অভ্যন্তরে আবার নানান স্বার্থের টানাপোড়েন চলে আসছে, সেখানে আসছে রাজনীতির প্রশ্ন — সেই রাজনীতি আবার রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে নানান রূপে বিন্যস্ত; এরপর এসে পড়ছে বাজারের প্রশ্ন। সব মিলিয়ে এই যে জট, তাকে আমরা খুলতে চাইছি কমিউনের ভাঙাগড়ার আলোচনার সীমায়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে বিশদ আলোচনা অন্যত্র করা দরকার। আমরা দেখার চেষ্টা করব এইসব কমিউনগুলো কী অবস্থায় ছিল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে যাঁরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে একটা সঠিক আন্দোলন হিসেবে মনে করেছিলেন, সেই অস্ট্রেলিয় দু'জন কী বলছেন দেখি : '১৯৫০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৬-র সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে পর্যন্ত যেভাবে প্রচার আন্দোলন হয়েছে সেরকম ভাবেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়েছে। প্রধানত, মাও চিন্তা পাঠ করার প্রচার, লক্ষ লক্ষ মানুষের বিরাট মিছিল, সবচেয়ে খারাপ দুষ্কৃতিদের জনসমাবেশের মধ্যে নিয়ে এসে দোষী সাব্যস্ত করা, হেনস্থা করা, কাউকে অপরাধ স্বীকার করানো, আত্মসমালোচনা ও ভুল স্বীকারের মধ্যে দিয়ে আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা। এর মধ্যে অল্প পরিমাণে হলেও রক্তপাত, গ্রেপ্তার করা ও পদচ্যুত করার ঘটনা থাকলেও মূলত জোর থাকত সামাজিক ও মানসিক চাপ দেওয়ার ওপর, কিন্তু অনেক সময় তা এমন তীব্র হত যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা আত্মহত্যার প্ররোচনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে ভাষা তাতে ব্যবহৃত হত তার তীব্র রং, লড়াকু উচ্চারণ, নাটকীয় প্রতিক্রিয়া, সামরিক উপমা ও চীনা সঙ্কেত অচৈনিকদের কানে বাজার মতো এবং পশ্চিমি সাংবাদিকরা তাকে কথার কথা হিসেবে নেয়নি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় এই পদ্ধতিই আরও ব্যাপকভাবে নেওয়া হয়েছিল এবং পার্টির বাইরে যুবকদের নতুন সংগঠন 'রেডগার্ড' বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল এই লড়াইয়ের প্রধান বাহিনী রূপে। ১৯৬৬-তে তিন মাসের মধ্যে দেড় কোটি থেকে দু' কোটি যুবক 'রেডগার্ড' বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল। এরা বেশিরভাগই মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের ছাত্র — বয়স তাদের দশ থেকে কুড়ির মধ্যে। অল্প কিছু যুবক শিক্ষকও ছিল। এই বাহিনীর সদস্য হওয়ার যোগ্যতা তাদেরই থাকত যারা মাও সেতুংয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জঙ্গি সমর্থক এবং যারা শ্রমিক-কৃষক-বিপ্লবের শহীদ, গণমুক্তি ফৌজ বা সেই ধরনের সর্বহারা পরিবার থেকে এসেছে। এদের বাহুতে বাঁধা থাকত লালপট্টি, হাতে মাওয়ের লেখা রেডবুক। সেই বই থেকে, তারা সামান্য সুযোগ পেলেই, উদ্ধৃতি পাঠ করে শোনাত ... চীনের যে কোনও জায়গায় যাওয়ার জন্য তাদের ট্রেনের ভাড়া লাগত না, খাওয়ার পয়সা লাগত না, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-আবাসনগুলোতে তাদের বিনা পয়সায় থাকার জায়গা দিত (কারণ গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ছিল, কোনটাই খোলেনি।) ... এরাই ছিল রাষ্ট্র সহ সমস্ত রকম কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার, সমালোচনা করার অধিকারী, সমাজে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাহক, সমস্ত রকমের পুরনো ধারণা-সংস্কৃতি-আচার-অভ্যাসকে ভেঙ্গেচুরে নতুন নিয়মের প্রবক্তা; কৃষক ও শ্রমিকদের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার অগ্রদূত ..."

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল বাহিনীর চেহারাটা একটু বিশদে বললাম। এরা কী কী করতে সক্ষম হতে পারে তার একটা আন্দাজ দেওয়ার জন্য। বস্তুত এই লেখকদেরই ভাষায়, "১৯৬৬-তে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বলার মতো কোনও পরিবর্তন হয়নি। মাও 'রেডগার্ড'-দের পার্টির সদর দপ্তরে কামান দাগতে বললেও আশু উৎপাদনে কোনও হস্তক্ষেপ হয়নি বলেই মনে হয়। বছরের শেষে, যে কারণেই হোক, উৎপাদনে ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে দেখে মাও বাধ্য হয়ে গণমুক্তি ফৌজকে ডেকে কিছু নির্দেশ দেন। সঠিক জানা না গেলেও বোধহয়, লিউ-এর যে সমস্ত আমলারা ক্ষমতাশালী পদে বসেছিল, তাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পার্টির কতকগুলো ব্যবস্থা তিনি ভেঙ্গে দিতে চাইছিলেন। ... ১৯৬৭-তে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যথেষ্ট ব্যাহত হল। সরকার বাধ্য হল, বিপ্লবী অভিজ্ঞতার অতিমাত্রার আদানপ্রদান থামাতে, যাতে চাষের ফলন ঠিক থাকে। গণমুক্তি ফৌজ অর্থনৈতিক কাজকর্ম চালু রাখতে সাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু ত্রিশ লক্ষের সেনাবাহিনী দুই কোটি পার্টি সদস্যকে প্রতিস্থাপিত করবে সেটা আশা করা যায় না।"

অর্থাৎ পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে নিজের চিন্তা প্রতিষ্ঠা করার উদ্বেগ থেকে শেষ পর্যন্ত মাওয়ের কাছে এই কথা বলা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল যে, 'প্রদেশগুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে হবে'। এই কথাটা কোনও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির নতুন পদক্ষেপ বলে মনে হয় না। বরং উপরোক্ত বর্ণনার সাথে মিলিয়ে পড়লে গতানুগতিক ভাবে চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে একটা আত্মরক্ষমূলক মন্তব্য বলে মনে হয়।

এই অবস্থায় গ্রামের কমিউনগুলোর নিয়ন্ত্রণ ছিল 'কাউন্টি' রেভেলিউশনারি কমিটির হাতে আর শহরের কাছাকাছি কমিউনগুলির উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ছিল মিউনিসিপ্যাল রেভেলিউশনারি কমিটি। এরকম অনেকগুলো কাউন্টি (জেলা) ও মিউনিসিপ্যালিটি মিলিয়ে এক একটা প্রদেশ আর গোটা চীনে মোট ৩৩টা এমন প্রাদেশিক কমিটির মাথায় হল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। কমিউনগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন নয়, এগুলো সমবায় সংগঠন যাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক স্বাধীনতা ছিল, যে কাউন্টির কাছে কমিউন শস্য জমা দিত ও রাসায়নিক সার ও যন্ত্রপাতি নিত, তাদের সাথে আলোচনা করেই শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও শস্য সরবরাহের বিষয়ে কিছুটা ঠিক হত। রাষ্ট্র মূল্য নির্ধারণ করত ও শস্য বেচা মোট টাকার ৬-৭ শতাংশ কর হিসেবে নিত। রাষ্ট্রকে সরাসরি সরবরাহ করার পাশাপাশি সমবায় বাজার চালু ছিল। এই সমবায় বাজারগুলো আরও আগে চালু হয়েছিল রাষ্ট্র, স্থানীয় সংগঠন ও ব্যক্তিগত পরিবারগুলোর যৌথ বিনিয়োগে। গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের সমবায় বাজারে খুচরো ও 'হোলসেল' বাণিজ্য চালু ছিল। কমিউনগুলো রাষ্ট্রকে দেয় শস্য সরবরাহের পরে বাড়তি শস্য কৃষি সমবায় বাজারে বিক্রি

করে দিত। কমিউন পরিচালনা বা আয় বন্টন কমিউন বা প্রোডাকশন ব্রিগেডের হাতে থাকত। প্রোডাকশন টিম চাষ করত। এদেরকে ওয়ার্ক পয়েন্ট অর্থাৎ কাজ অনুযায়ী মজুরি দেওয়া হত। হিসেব রাখত (টিমের মোট উৎপাদন যত বেশি হত, তত তাদের প্রতি ওয়ার্ক পয়েন্টের দাম বাড়ত) মূলত প্রোডাকশন ব্রিগেড। এরা হাঁস-শুয়োরের খামারও চালাত। প্রতিটা প্রোডাকশন টিমে ১১ থেকে ১০০টা পরিবার থাকত। গড়ে ৩৩টা পরিবারের টিম গড়ে ২০ হেক্টর জমি চাষ করত। প্রতিটা প্রোডাকশন ব্রিগেডে গড়ে ২০ থেকে ১০০০ প্রোডাকশন টিম থাকত। কমিউনগুলোতে ৬ থেকে ১৭টা ব্রিগেড বা ৫৬ থেকে ২৭৫টা টিম থাকত। ১৯৬৩-তে এরকম কমিউনের সংখ্যা ছিল ৭৫ হাজার। আর ১৯৭৫-এ কমিউনগুলোকে কেন্দ্রীভূত করে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫০ হাজার। এগুলোর গড় জনসংখ্যা ছিল ১৪ হাজার ৭০০, গড় জমির পরিমাণ ২০০০ হেক্টর। ছোটোখাটো শিল্প কারখানার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের ভার থাকত কমিউনের হাতে। দু'বছরের জন্য নির্বাচিত একজন ম্যানেজার কমিউনের প্রতিদিনের কাজ চালাত।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে কমিউনগুলোর সাংগঠনিক চেহারা কেমন ছিল তা খানিক দেখা হল। কারখানাগুলোতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বড়ো পরিবর্তন হ'ল 'পিসরেটে কাজ', বোনাস, প্রাইজ ইত্যাদি সমস্ত বৈষয়িক উৎসাহদানের প্রকল্প বন্ধ করে দিয়ে নৈতিক উৎসাহদানের মধ্যে দিয়ে উৎপাদনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যাকে বলা হয়েছে, 'লাভ নয়, রাজনীতিই চালিকা শক্তি'। ফলে শ্রমিকদের মজুরি যা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে তাই স্থির থাকবে। যেহেতু মজুরি সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকছে, তাই ব্যক্তিগত আয়কর দেওয়ার কোনও ব্যাপার থাকল না। আর এই কর্মপদ্ধতি চালু রাখার ক্ষেত্রে বড়ো পরিবর্তন হল — আগে প্রাদেশিক ব্যুরোর সাথে আলোচনা করে কারখানা চালাত কারখানার ম্যানেজারেরা। এখন কারখানার শ্রমিকদের যে বিপ্লবী কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে, তারাই পরিচালনা করে প্রাদেশিক বিপ্লবী কমিটির সাথে। এই বিষয়ে অস্ট্রেলিয় লেখকদ্বয়ের মন্তব্য, 'একভাবে দেখলে রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কারখানার তুলনায় কমিউনের স্বাধিকার বেশি।'

১৯৬৬-৬৮, ম্যাকফারলেন ও হুইলরাইটের স্বচক্ষে দেখা চীনের বর্ননায় 'কমিউন ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব' নামে একটা পরিচ্ছেদ আছে। তাতে যা লেখা আছে তার বেশিরভাগটাই হল কমিউনগুলোতে গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড-এর ধারাবাহিকতায় আরও বড়ো বড়ো জলাধার, পতিত জমি উদ্ধার, কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির বর্ণনা। বৈষয়িক উৎসাহ প্রদানের বদলে নৈতিক উৎসাহ প্রদান করে বা ব্যক্তিগত জমিতে চাষের বদলে সমবায়ের জমিতে বেশি চাষ করে বলার মতো খুব বেশি যে উৎপাদন বেড়েছে এমনটা তাঁরা দাবি করেননি, করার কথাও না। প্রসঙ্গত ইউরেশিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত চীন সম্পর্কিত বিশ্বকোষে দেখা যাচ্ছে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৬৮-তে চীনের মোট শস্য উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২১.৫, ২৩.০ ও ২১.৫ কোটি টন। তবে ওঁদের এই লেখার দুটো গুরুত্বপূর্ণ অংশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

প্রথম, "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ের সাথে সান জি ই বাও যুগের প্রধান তফাত দুটো। আগে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, ঋণ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সাহায্য যা আসত তার ওপর চাপ সৃষ্টি করত 'কৃষকদের বৈষয়িক ভাবনা'; এখন নৈতিক ও উৎসাহদানের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভরতার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে 'সমাজের' ওপর নির্ভর করে আগাছার মতো বেঁচে না থাকার ইচ্ছা। তাছাড়া, আগে পরিবারগুলোর আয়ের ১২ শতাংশ আসত তাদের ব্যক্তিগত জমি থেকে। এখন তাদের উৎসাহিত করা গেছে যাতে তারা ব্যক্তিগত বীজ, সার ইত্যাদি সমবায়ের হাতে তুলে দেয়।"

দ্বিতীয়, তাঁরা দেখেছেন যে, উৎপাদন বাড়ার অর্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কমিউনগুলির নিজেদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে পারা এবং বাড়তি উৎপাদনটুকু রাষ্ট্রের কাছে কর হিসেবে জমা দিতে পারা বা রাষ্ট্রের কাছে বেচতে পারা। অনেকগুলো গরিব কমিউনও ছিল, যাদের খাদ্যের জন্য রাষ্ট্রীয় সরবরাহের ওপর নির্ভর করতে হত। পরে তাদের সংখ্যা কমে এসেছে। তাঁরা আরও বলছেন, "বিভিন্ন ব্রিগেডের মধ্যে 'অংশভাগ'-এর খুব বড়ো তফাত আছে, সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে প্রতিদিন মাথা পিছু আয় ১.৫ থেকে ১.৬ ইউয়ান এবং সর্বনিম্ন আয় তার তিনভাগের একভাগ। এইভাবে সবচেয়ে ধনী ব্রিগেড যাতে অন্যান্য দ্রব্য উপার্জন এবং ব্যক্তিগত জমি থেকে উপার্জন করাকে ছাড় দিয়েও গড় শ্রমিকের আয়ের মাত্রায় পৌঁছতে পারে। কিন্তু আরও অনেক কম সৌভাগ্যবান আছে যারা অনেক নিচেই থাকবে। গ্রামাঞ্চলে আয়ের এই তফাতের অনেক কারণ আছে, যেমন অঞ্চলের প্রকৃতি, জমির উর্বরতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও স্থানীয় উদ্যোগ।"

কমিউনের শেষ পর্ব

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরবর্তী দিনগুলোতে কমিউনগুলো কেমনভাবে চলেছে সে কথায় যাওয়ার আগে একটা দরকারি কথা সেরে রাখি। ১৯৫৮-র গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড-এর প্রাথমিক সাফল্যের সময়ে কমিউনগুলোতে বিশাল বিশাল রান্নাঘর তৈরি হয়েছিল — যাকে বলা যায় গণ-রান্নাঘর। সেই সময়ে দেশজুড়ে সবার খাওয়াদাওয়া এবং যাকে বলে বিনি পয়সার ভোজ সম্পর্কে কিছু কথা আমরা আগে বলেছি। এই রান্নাঘরগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও খোঁজ কিন্তু পরবর্তীকালের কোনও লেখায় পাওয়া যাচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে বেকার 'হাংরি ঘোস্টস্'-এ লিখেছেন, "লুশানে মিটিংয়ের আগে মাও হুনানের শাওসানে তাঁর নিজের গ্রামে যান এরকম একটা ভাবনা নিয়ে যে তাঁর আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই তাঁকে সত্যি কথা বলবে। তাদের কাছ থেকে নানা অভিযোগের কথা শুনে তিনি এমন মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি গণ-রান্নাঘর, জলাধারের প্রকল্প বা বাড়ির পেছনে লোহা বানানোর প্রয়াস কোনটা কাজের না হয়, তাহলে সেগুলো ভেঙ্গে দেওয়াই ভালো। এই মন্তব্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু হুনানের কিছু গ্রামে তা ছড়িয়ে পড়েছিল। অল্প সময়ের জন্য হলেও হুনানের এক অংশে গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড পরিত্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু লুশান মিটিংয়ের পর প্রদেশের প্রথম সম্পাদক ঝৌ সিনোঝৌকে দক্ষিণপন্থী বলে পদচ্যুত করার পর, পরবর্তী সম্পাদক ঝাং পিন হুয়া আবার ওগুলো চালু করেন। সব মিলিয়ে হুনানে গণ-রান্নাঘর টিকে ছিল মোট সাড়ে তিন বছর, যা কিনা অন্যান্য যে কোনও জায়গা থেকে বেশি।" যৌথ রান্নাঘরের প্রসঙ্গটা জরুরি বললাম, কারণ কমিউন ছিল একটা যৌথ জীবনের প্রতীক যা সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এরকমটা মনে করার জন্যই ১৯৬৯ সালে যখন লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে জনগণের থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য গ্রামে পাঠানো হয়েছিল, তখন আমরা দেখেছি তারা গ্রামের প্রোডাকশন ব্রিগেডগুলোর সাথে একসাথে থাকা-খাওয়া-কাজ করা ও মাও সেতুং চিন্তাধারা পাঠ করার প্রয়াস নিয়েছিল।

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত কমিউনগুলোর অবস্থা সম্পর্কে বেশি খবর সংগ্রহ করা যায়নি। আমরা যা পাচ্ছি, তা এরকম : চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসে লেখা হচ্ছে :

"২৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ : গণকমিউনগুলোর বন্টন বিষয়ে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটি নির্দেশ জারি করে। অতিবাম ঝোঁকের প্রভাবে গ্রামাঞ্চলে বন্টনের সাম্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং চাষিরা তাদের প্রাপ্য ঠিকমতো পায়নি। এটা তাদের উৎপাদনের উৎসাহকে কমিয়ে দিয়েছিল। এই ব্যাপারে 'দাঝাই প্রোডাকশন ব্রিগেড'কে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করা ও স্থানীয়

বাস্তব অবস্থার বিচার না করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি এদেরকে সমালোচনা করে। আরও বলা হয়, 'তাদেরকে বলা হয়েছিল, নিজেদের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করতে এবং যে সমস্ত উপায় কৃষকরা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ও যে উপায়গুলো সহজে ব্যবহার করা যায় সেগুলোকেই প্রয়োগ করতে।' কেন্দ্রীয় কমিটি জোর দিয়ে বলে যে কৃষিক্ষেত্রে বহুমুখী অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী বলে সমালোচনা করা ভুল এবং সবদিক দিয়ে কৃষির বিকাশের প্রয়োজন আছে। কেন্দ্রীয় কমিটি কতকগুলো বিশেষ কর্মনীতি গ্রহণ করল, যেগুলো সমবায়ের উৎপাদন বাড়াবে এবং কৃষকদের ব্যক্তিগত আয় বাড়িয়ে তাদের ওপর চাপানো ভার লাঘব করবে এবং কৃষকরা তাদের প্রাপ্য ঠিকমতো পাবে। এই নির্দেশ গ্রামীণ জনগণ ও সদস্যরা আনন্দের সাথে গ্রহণ করল।

৭ জানুয়ারি থেকে ৩০ মার্চ ১৯৭৩ : বেজিং–এ জাতীয় পরিকল্পনার সম্মেলন হল। ... সেখানে চৌ এন লাই জোর দিয়ে বললেন, যে যতটা কাজ করবে সে ততটা পাবে এবং কাজের জন্য পুরস্কার চালু করার প্রয়োজন আছে ...। ... এই দলিল সরকারিভাবে বিতরণ করা হল না। তা সত্ত্বেও বাস্তবে তা কাজকে উৎসাহিত করল, কারণ এই বিষয়টা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে দেশের নানা অংশে ছড়িয়ে পড়ল।"

ওপরের দুটো অংশ থেকেই, 'উৎপাদনে বৈষয়িক উৎসাহের পরিবর্তে নৈতিক উৎসাহ' — কমিউন এই মূল আদর্শতে জোর হারাচ্ছে সেটা পরিষ্কার। এরপরে কমিউনগুলোর বিলুপ্তির বিষয়ে ঢোকার আগে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' অবশিষ্টাংশ সরকারিভাবে সমাপ্ত হওয়া বিষয়ে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস থেকে সামান্য একটু দেখব। কারণ, সরকারিভাবে কমিউনগুলি শেষ হয়ে গেছে ওই একই সময়ে। কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসে রয়েছে : "যাদেরকে দক্ষিণপন্থী বলা হয়েছিল তাদের ওপর থেকে ওই তকমা তুলে ফেলার কর্মসূচি'কে কেন্দ্রীয় কমিটি সম্মতি জানাচ্ছে ৫ এপ্রিল ১৯৭৮–এ। ১৯৭৯ সালের ১১ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটি 'কৃষিতে উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত' এবং 'গ্রামীণ কমিউনগুলোর কাজের বিষয়ে' প্রাথমিক প্রয়োগের খসড়া প্রকাশিত করে। ... এতে কৃষকদের বৈষয়িক লাভের দিকে নজর দেওয়া, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে মর্যাদা দেওয়া, কৃষি উৎপাদন সহায়তায় রাষ্ট্রের সাহায্য দান ইত্যাদি ২৫টি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে (উৎপাদনে দায়িত্ব–ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সহ) কৃষিতে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের জন্য এবং কৃষির আধুনিকীকরণের জন্য। এইসব পদক্ষেপগুলো গ্রামীণ কাজে বহুদিন ধরে টিকে থেকে 'বাম' বিচ্যুতিগুলোকে সংশোধন করতে সহায়তা করল এবং কৃষকদের উৎপাদনে উৎসাহিত করল। ... একই দিনে কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ধনী কৃষক ও জমিদাররা যদি আর প্রতিক্রিয়াশীল পথ গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের তকমা মুছে দিয়ে গণকমিউনের সাধারণ সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে।"

ইউরেশিয়া প্রেসের বিশ্বকোষ লিখছে, "যদিও ওই দলিলে লেখা হয়েছে যে উৎপাদনে দায়িত্ব দেওয়া হবে ছোটো ছোটো কর্মী–গোষ্ঠীর ওপর, কিন্তু নির্দিষ্ট করে গোষ্ঠীর আকার কী হবে বলা হয়নি। সাধারণ মানুষ কিন্তু ছোটো গোষ্ঠী বলতে পরিবারকেই ধরে নিয়েছিল। আর এখান থেকেই শুরু হয়েছিল পরিবারগুলোতে ফিরে যাওয়া।"

ওই বিশ্বকোষেরই আরেক জায়গায় আরও নাটকীয়ভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, "এই সংস্কার প্রথমে শুরু হয় আনহুই প্রদেশের সিয়াওগাং নামক একটা ছোট্ট গ্রামে ১৯৭৭ সালের এক শীতের রাত্রে। গ্রামের উৎপাদন টিমের নেতার বাড়িতে বারোজন চাষি মিলিত হয়ে আঙুলে রক্তের ছাপ দিয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত করে, যে, তারা আর কখনও সমবায় প্রথায় চাষ করবে না। যদিও পরবর্তীকালের গবেষণায় দেখা গেছে যে ওয়েং ঝৌ ও সেজিয়াং প্রদেশের বেশ কিছু গ্রামে ১৯৬৬ সাল থেকেই পারিবারিক চাষের পদ্ধতি চালু ছিল। সিয়াওগাং–এর ঘটনা এই সংস্কার আন্দোলনকে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে দেয় এবং বেশিরভাগ চীনা গ্রামেই পারিবারিক চাষ শুরু হয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত ১৯৮৪ সালে সরকারিভাবে কমিউন প্রথার পতন ঘটে।"

কিছু মন্তব্য

বর্তমান প্রবন্ধের বিচারে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও কমিউন প্রথার মধ্যে সামান্য কিছু সম্পর্ক থাকলেও কমিউনগুলির গড়ে ওঠা, চলা ও শেষ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। কারণ, আমরা দেখলাম, কৃষি সমবায় থেকে কমিউনগুলি গড়ে উঠেছিল ১৯৫৮ সালে গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ডের জোয়ারে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচি এসেছিল ওপর থেকে। কমিউনের সিদ্ধান্তও এসেছিল ওপর থেকে। কিন্তু তা গ্রামের প্রান্তিক–সাধারণের সহজাত পারস্পরিক সহযোগিতায় বেঁচে থাকার অভ্যাসের ভিত্তির ওপর ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছিল। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১–র অর্থনৈতিক সঙ্কটের ধাক্কা তাতে যে ভাঙন ধরিয়েছিল তা আর সেরে উঠতে পারেনি। এরপর থেকে গ্রামের চাষবাস আর কমিউনের সরাসরি অন্তর্ভুক্ত রইল না; কমিউন থাকল মূলত এক রাজনৈতিক ভূমিকায়। গ্রামে তার অর্থনৈতিক ভূমিকা হয়ে গিয়েছিল গৌন। গ্রামে কাজ করতে আসা যুবক দলের মাধ্যমে, গ্রামাঞ্চলে পার্টির শাখার মাধ্যমে, পরে রেডগার্ডের মাধ্যমে কমিউন গ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি তা চীনা কৃষকের আত্মা স্পর্শ করতে পারত, তাহলে এত সহজে নিঃশব্দে কোনরকম বড়ো বাধা ছাড়াই সত্তরের দশকের শেষার্ধে 'হাউসহোল্ড প্রোডাকশন রেসপন্সিবিলিটি সিস্টেম' বা পারিবারিক উৎপাদন–দায়িত্বের ব্যবস্থা পুরোদমে চালু হয়ে যেতে পারত না। গোটা ইতিহাস খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে আর্থিক সঙ্কটের পর থেকে চীনের কৃষক ঘরের দিকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল বাঁচার জন্য। কমিউনের আঙ্গিকে সমাজতন্ত্রের বাস্তব প্রকল্প এক শুভ ইচ্ছাতেই পর্যবসিত হল।

সূত্র :

1. ***China Shakes the World*** **by Jack Belden (1989) New World Press, Beijing, China.**
2. ***Modern China's Economy and Mangement*** **Edited by Ma Hong (1990), Foreign Languages Press, Beijing.**
3. ***ফানশেন,*** **উইলিয়াম হিন্টন (১৯৭৫), দিশারী (কাশিনাথ দাস) কলকাতা – ৭০০০০৯, রূপলেখা (নমিতা সাধুখাঁ), ২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট।**
4. ***The Chinese Road to Socialism*** **by E. L. Wheelwright and Bruce Mcfarlane (1973), Penguin Books Ltd. Harmondsworth, Middlesex, England.**
5. ***History of the Chinese Communist Party, A chronology of Events (1919-1990)*** **Compiled by the Party Research Centre of the Central Committee of the Chinese Communist Party (1991), Foreign Language Press, Beijing.**
6. ***Selected Works of Mao-Tse-Tung, vol 8 & 9.*** **(1994) Kranti Publication, Secundrabad.**
7. ***Hungry Ghosts – Mao's Secret Famine*** **by Jasper Backer (1996), Free Press, Great Britain.**
8. ***The Cambridge Encyclopedia of China*** **(1991) Cambridge University Press, 2nd Edition, 1991.**
9. ***China Today, an Encyclopedia*** **(2005) Greenwood Pres, London.**
10. ***Encyclopedia of China Today*** **(1982), Eurasia Press, 3rd Edition.**
11. ***Histry in Communist China*** **(1968), edited by Albert Fuererkar. Cambridge : The MIT Press.**

নিক্সনের চীন সফর এবং সাংহাই ঘোষণাপত্র

জিতেন নন্দী

১৯৭২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফর এবং নিক্সন–মাও আলাপ ছিল সেদিনের এক তাজ্জব ঘটনা। চীন তখন বিশ্ববাসীর কাছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের দুর্গ; মাও সেতুঙ তখন সেই লড়াইয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। বিশেষত কোরিয়ার যুদ্ধের পর ভিয়েতনামেও মার্কিন আক্রমণ প্রতিহত হয়েছে; কাম্বোডিয়া, লাওসে লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে; সেই লড়াইগুলিকে সরাসরি মদত করছে মাও সেতুঙের চীন। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে তার বোঝাপড়া ভেঙে গেছে; সোভিয়েতকে মাও সেতুঙ 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' বলে চিহ্নিত করেছেন। সেই বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের মধ্যে; সেখানেও বিভাজন ঘটেছে, সর্বত্র তাদের একাংশের কাছে বিপ্লবের ঝটিকা–কেন্দ্র সোভিয়েত থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে চীনে। আমাদের এখানেও তখন কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হচ্ছে : চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান!

সেদিনের বামপন্থী আন্দোলনে 'নিক্সন', 'ম্যাকনামারা', 'ক্রুশ্চেভ', 'মাও', 'লিন পিয়াও', এমনকী 'প্রফুল্ল সেন', 'ইন্দিরা গান্ধী' ইত্যাদি নামগুলির রাজনৈতিক প্রভাব আজকের থেকে বেশি ছিল। এক–একটা নামকে ঘিরে পক্ষে–বিপক্ষে রাজনৈতিক বিরোধ চরম আকার নিত। আজ আমরা সেই সময়টা থেকে অনেক দূরে এসে দাঁড়িয়েছি। তবে অন্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মতো নিক্সন–মাও আলাপকেও আমরা সেদিনের বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বুঝতে চাইছি।

আমাদের কাছে প্রশ্নটা এরকম, আমেরিকার দিক থেকে চীনের সঙ্গে হঠাৎ বন্ধুত্ব করতে চাওয়া হল কেন? চীনই বা 'সাম্রাজ্যবাদী' হিসেবে সবচেয়ে কুখ্যাত আমেরিকার সঙ্গে হাত মেলাতে চাইল কেন? আমেরিকায় নিক্সন নিজে চরম কমিউনিস্ট–বিরোধী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারকে জানালেন, তিনি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টাকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিতে চান। তিনি একথাও বলেছিলেন, "আমরা চীনকে এশিয়ায় আমাদের সমস্ত অসুবিধার মূল কারণ হিসেবে দেখতে পারি। যদি চীন কমিউনিস্ট না হয়ে উঠত, তাহলে কোরিয়ায় আমাদের যুদ্ধ করতে হত না। যদি চীন কমিউনিস্ট না হত, তাহলে ইন্দোচীনে কোন [ভিয়েতনাম] যুদ্ধ লাগত না।"

কিন্তু সেই সময় খোলাখুলি চীনের সঙ্গে হাত মেলাতে যাওয়ার উপায় মার্কিন সরকারের ছিল না। ভিয়েতনাম নিয়ে খোদ আমেরিকায় এবং অন্যত্র প্রবল নিন্দা ও সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে মার্কিন সরকারকে। সেখানে চীন যুদ্ধরত উত্তর ভিয়েতনামের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া, চীনে সদ্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে নিক্সনকে 'দুর্বৃত্ত', 'রক্তে রাঙা কসাইয়ের ছুরি' হাতে, ইত্যাদি উপমায় চিহ্নিত করা হয়েছে। তারও টাটকা প্রভাব সর্বত্রই রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা ও চীন উভয় দেশের নেতাদের পক্ষেই খোলাখুলি এগোনো মুশকিল ছিল। অতএব প্রায় তিন বছর ধরে একটা প্রক্রিয়া চলল যথাসম্ভব গোপনে। কিন্তু দু'পক্ষের এই গোপন আগ্রহের কারণ কী ছিল?

আজকের পাকিস্তানের আফগান–সীমান্তে ওয়াজিরিস্তানে তালিবানদের ওপর মার্কিন হানার সঙ্গে সেদিনের ভিয়েতনামের পরিস্থিতির একদিক থেকে কিছুটা মিল পাওয়া যায়। আপাতভাবে ভিয়েতনামের বিদ্রোহীদের দমন করা আমেরিকার কাছে কোন ব্যাপারই ছিল না। প্রযুক্তি, অর্থনীতি সমস্ত দিক থেকে প্রবলতম ২৫ কোটি জনসংখ্যার একটা দেশ সামান্য কৃষিনির্ভর ২ কোটির প্রতিপক্ষ দেশকে অনায়াসে গুঁড়িয়ে দিতে পারে বলেই সকলের মনে হয়েছিল। ভিয়েতনামকে সোভিয়েত আর চীনের অস্ত্র সাহায্যও আমেরিকার কাছে ভয়ের তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ সমস্ত হিসেবকে ওলটপালট করে দিল। ধনী দেশ হলেও ভিয়েতনামে আটকে গিয়ে আর্থিক দণ্ড দিতে হল মার্কিন পক্ষকে। ওদিকে ১৯৬২ সাল থেকেই চলছিল আমেরিকায় বাজেট ঘাটতি। বেড়ে গেল মুদ্রাস্ফীতি আর ঋণের বোঝা। বিদেশ থেকে তেল আমদানির ওপর ক্রমাগত নির্ভর করতে হচ্ছিল। কমিউনিস্টরা যখন ১৯৬৮–তে সাইগনে আমেরিকান দূতাবাসের সামনের অংশটা দখল করে নিল, তখন আমেরিকার মানুষ বুঝতে পারল যুদ্ধটা হাতের বাইরে চলে গেছে। আমেরিকা জুড়ে সর্বত্র আওয়াজ উঠল, যুদ্ধ বন্ধ করো!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দু–দুটো দশক আমেরিকায় নিজেদের আর্থিক উন্নতি নিয়ে একটা আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নিরিখে ওই সময়টাকে বলা হয়েছিল আমেরিকান পুঁজিবাদের 'স্বর্ণযুগ'। ইতিমধ্যে 'মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স' নামক সামরিক শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা অসামরিক ক্ষেত্রের বেসরকারি ব্যবসার সঙ্গে মিলে আমেরিকায় একটা আর্থিক সুসময় তৈরি করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ঠান্ডাযুদ্ধ, কোরিয়ার যুদ্ধ এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধ এই 'মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স'–এর আদর্শগত ভিত্তিকে মজবুত করেছিল। কিন্তু এবার এমন এক সংকট ঘনিয়ে উঠল, যারই পরিণতি ছিল ১৯৭৪–৭৫ সালের মন্দা — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচাইতে তীব্র সংকট। এই অবস্থাটা মার্কিন নেতাদের কূটনৈতিক মনোভাবকে প্রভাবিত করল। এশিয়াতে, বিশেষত চীনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমেরিকার মনোভাব বদল করার এটা ছিল অন্যতম কারণ।

চীনের দিক থেকে সমস্যাগুলি ছিল আলাদা। ১৯৪৯–এর বিপ্লবের পর প্রথমে তার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। আমেরিকা এই কমিউনিস্ট জোটকে মোটেই পছন্দ করত না। ১৯৪৫ সালে যখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ তৈরি হল, তাইওয়ান থেকে কুয়োমিনটাঙ শাসিত চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বাধীন 'চীনা প্রজাতন্ত্র' রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পেল। কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন 'গণ–প্রজাতন্ত্রী চীন'–কে নিরাপত্তা পরিষদে স্থান না দেওয়ায় সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধি ১৯৫০ সালে আটমাসের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বয়কট করল। ১৯৬০–এর দশক থেকে আলবেনিয়ার এনভার হোজার নেতৃত্বে কিছু রাষ্ট্র তাইওয়ানের প্রতিনিধির বদলে পিকিংয়ের প্রতিনিধিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে সদস্যপদ দেওয়ার জন্য প্রতিবছর প্রস্তাব পেশ করতে থাকে। ইতিমধ্যে নতুনভাবে গড়ে ওঠা স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিও পিকিংয়ের পাশে দাঁড়াতে শুরু করে। মার্কিন নেতৃত্বও পুরনো মনোভাব বদল করে। এর ফলে ১৯৭১ সালের ২৫ অক্টোবর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ গণ–প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিনিধিকে স্বীকৃতি দেয়। অপরদিকে প্রজাতন্ত্রী চীনের সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়।

পিকিংয়ের শাসকেরা বরাবরই তাইওয়ানকে চীনের অংশ বলে মনে করে এসেছে। তাইওয়ানের শাসকেরা প্রথমে পাল্টা দাবি করলেও পরে ১৯৯১ সালে সেখানকার সরকার তাইওয়ান হিসেবেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে সদস্যপদের আবেদন করে। এতে অবশ্য সেখানকার সরকারের আবেদনের প্রতি তাইওয়ানে এবং ইউরোপে নতুন করে সমর্থন গড়ে ওঠে। এছাড়া, তাইওয়ানের স্বাধীনতার

একটি নতুন আন্দোলনও সেখানে গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের প্রবক্তারা চীনের মূল ভূখণ্ড এবং বহির্মঙ্গোলিয়ার এতদিনকার দাবি থেকে সরে এসে পৃথক 'তাইওয়ান প্রজাতন্ত্র' গড়ে তুলতে চায়। কুয়োমিনটাঙ (প্রজাতন্ত্রী চীন) এবং কমিউনিস্ট (গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন) দুই নেতৃত্বই তাইওয়ানের এই স্বাধীনতার দাবিকে অপছন্দ করে।

নিক্সন চীন সফরে এলে চীনা নেতৃত্বের দিক থেকে আলোচনায় অন্যতম গুরুত্ব পায় তাইওয়ানের প্রসঙ্গ। ১৯৫০-এর দশক থেকেই আমেরিকা তাইওয়ানকে সামরিক সাহায্য দিয়ে এসেছে। তা নিয়ে চীনের প্রবল আপত্তি ছিল। (এই ২০১০ সালেও তাইওয়ানকে আমেরিকার এফ-১৬ ফাইটার জেট বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়ে চীন প্রবল আপত্তি প্রকাশ করেছে। অতএব চীনের উদ্বেগটা অনুমান করা যায়।) অবশ্য নিক্সনের আনুষ্ঠানিক সফরের আগেই ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে গোপনে এবং অক্টোবর মাসে সরকারিভাবে কিসিঞ্জার চীনে আসেন। নিক্সনের সফরকে সমস্ত দিক থেকে কার্যকর করে তোলার জন্যই ছিল এই অগ্রিম উদ্যোগ। পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে নিক্সন চীনে আসেন। এক সপ্তাহ তিনি সেখানে থেকে আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার আগে দু'পক্ষ যৌথভাবে 'সাংহাই ঘোষণাপত্র' প্রকাশ করে। এই ঘোষণাপত্র বাদ দিয়েও মাও সেতুঙের সঙ্গে, বিশেষত বিস্তারিতভাবে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গে নিক্সন এবং কিসিঞ্জারের আলোচনার বিবরণগুলি দীর্ঘদিন গোপন রাখা হয়েছিল। ২০০৩ সালের নভেম্বর মাসে সেগুলি প্রকাশিত হয়।

ডিক্লাসিফায়েড বা উন্মুক্ত এই নথিপত্র থেকে আরও কিছু তথ্য জানা যায়। যেমন, পেঙ মেঙ-মিন প্রসঙ্গ। তাইওয়ানে জন্মগ্রহণ করে ন্যাশনাল তাইওয়ান ইউনিভার্সিটিতে তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শিক্ষকতা করতেন। চিয়াং কাইশেক তাঁকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তাইওয়ানের প্রতিনিধির উপদেষ্টা পদে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু তিনি চিয়াং কাইশেকের একনায়কতান্ত্রিক সরকারের ঘোর বিরোধিতা করতে শুরু করেন। ১৯৬৪ সালে পেঙ তাঁর দুজন ছাত্রকে নিয়ে একটা ইশতেহার প্রকাশ করেন। এতে চিয়াং সরকারের পতন ঘটিয়ে তাইওয়ানে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের আহ্বান রাখা হয়। তিনজনকেই গ্রেপ্তার করা হয় দেশদ্রোহিতার দায়ে পেঙকে আটবছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক চাপে চিয়াং তাঁকে চোদ্দ মাস পরে কারামুক্ত করে গৃহবন্দি করে রাখেন। ১৯৭০-এর গোড়ায় তিনি সুইডেনে পালিয়ে যান এবং মিচিগান ইউনিভার্সিটিতে যুক্ত হওয়ার জন্য আমেরিকার ভিসার আবেদন করেন। কুয়োমিনটাঙ ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি উভয়েই এই আবেদনের বিরোধিতা করে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট এই ভিসা মঞ্জুর করে। চৌ এন-লাইয়ের অভিযোগ ছিল, সিআইএ পেঙকে তাইওয়ান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে এবং পেঙের উদ্যোগে গড়ে ওঠা তাইওয়ানের স্বাধীনতা আন্দোলনকেও আমেরিকা মদত করছে। নিক্সন এবং কিসিঞ্জার এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। চীনা নেতৃত্বের এই উদ্বেগ সম্পর্কে কিসিঞ্জার মন্তব্য করেছিলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম, কোন আমেরিকান কর্মচারী ... তাইওয়ানের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কোনভাবেই কোন উৎসাহ বা সমর্থন দেবে না ... যদি আমাদের সমর্থন-নিরপেক্ষভাবে তা গড়ে ওঠে, তাইওয়ানের আন্দোলনকে দমন করার জন্য বলপ্রয়োগ আমরা করতে পারি না।" তবে এতেও চীন পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারেনি। বাইশ বছর আমেরিকায় নির্বাসনে কাটিয়ে ১৯৯৫ সালে যখন পেঙ তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে স্বাধীনতা-পন্থী ডেমোক্রাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টির পক্ষ থেকে প্রার্থী হন, চীনা নেতৃত্ব যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তারা তাইওয়ান প্রণালীতে ব্যাপক নৌবাহিনীর মহড়া করে, ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে। যদিও পেঙের জেতার আশা ছিল না। কিন্তু ঘটনাটাকে এতখানি গুরুত্ব দিয়েছিল চীনা নেতৃত্ব।

এছাড়া, চীনের দিক থেকে আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছিল জাপানের প্রসঙ্গ। ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে জাপান যেভাবে রপ্তানি সাফল্য পেয়েছিল, চীনের উদ্বেগ ছিল জাপান আবার দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানে সামরিক সম্প্রসারণ ঘটাবে। নিক্সন এবং কিসিঞ্জার চৌ এন-লাইকে আশ্বস্ত করেন, যেহেতু জাপানের সঙ্গে আমেরিকার নিরাপত্তা চুক্তি রয়েছে, ওয়াশিংটন জাপানের সামরিক ও রাজনৈতিক সম্প্রসারণের প্রবণতাকে রোধ করতে পারবে।

আর একটি তথ্য গোপন রাখা হয়েছিল। তা হল, কিসিঞ্জার চীনা নেতৃত্বকে চীন-সোভিয়েত সীমান্তে মোতায়েন সোভিয়েতের রণসজ্জা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন। ওই অঞ্চলে সোভিয়েতের বিশেষ ট্যাকটিকাল এয়ারক্র্যাফট ও ক্ষেপণাস্ত্র, স্ট্র্যাটেজিক বায়ু প্রতিরক্ষা, স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেপণাস্ত্র, বিশেষত পরমাণু অস্ত্রগুলির অবস্থান সম্পর্কে জানানো হয়। (প্রসঙ্গত, চীন ১৯৬৪ সালে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করেছিল।) কিসিঞ্জার বলেন, "এমনকী গোয়েন্দা বিভাগও জানে না যে আমরা এই তথ্যগুলি আপনাদের দিচ্ছি।"

এক বিশেষ বিশ্ব-পরিস্থিতিতে আমেরিকা ও চীন দৃশ্যত দুই বিপরীত মেরু থেকে এসে মিলেছিল এক ঐতিহাসিক বোঝাপড়ায়। তাৎক্ষণিকভাবে দুই রাষ্ট্র এবং দুই নেতৃত্বেরই আলাদা আলাদা আশু বিষয় ছিল সেদিন। কিন্তু নিক্সনের এই সফরের তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। সপ্তাহব্যাপী সফরের পর নিক্সনের মন্তব্যে তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল : "এই সপ্তাহটা দুনিয়াকে পাল্টে দিয়েছিল; ১৬০০০ মাইল দূরত্ব এবং ২২ বছরের বৈরিতা যা আমাদের অতীতে বিভক্ত করে রেখেছিল, তার মাঝে একটা সেতু রচনা করতে ঘোষণাপত্রে আমরা যা বলেছি সেগুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল সামনের বছরগুলিতে আমরা যা করব। আর আজ আমরা যা বলেছি, তা হল, আমরা সেতুবন্ধন করব।"

নিক্সনের সামনের সেই বছরগুলি আমাদের সামনে দিয়ে পার হয়ে চলেছে। আজকের বিশ্বের অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে তার প্রভাব কতখানি, সেটা আর একটা আলোচনা।

পরিশিষ্ট : **এখানে উল্লিখিত সাংহাই ঘোষণাপত্রের মূল বয়ানটি হুবহু বঙ্গানুবাদ করে ছাপানো হল। সূত্র** : *Nixon and Mao, The Week that Changed the World* by Margaret Macmillan.

সাংহাই ঘোষণাপত্র

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের আমন্ত্রণে ১৯৭২ সালের ২১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি চীন সফর করেন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, ইউ.এস. সেক্রেটারি অফ স্টেট উইলিয়াম রজার্স, প্রেসিডেন্টের সহকারী ড. হেনরি কিসিঞ্জার এবং অন্য আমেরিকান অফিসারেরা।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের সঙ্গে দেখা করেন ২১ ফেব্রুয়ারি। দুই নেতার মধ্যে চীন-মার্কিন সম্পর্ক এবং বিশ্বের নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও খোলামেলা মত বিনিময় হয়।

সফর চলাকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার পাশাপাশি দুই পক্ষের আগ্রহের অন্য বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত, আন্তরিক এবং খোলামেলা আলোচনা হয়। এর পাশাপাশি সেক্রেটারি অফ স্টেট উইলিয়াম রজার্স এবং বিদেশ মন্ত্রী চি পেঙ-ফেইয়ের মধ্যেও একই ভাবে আলোচনা চলে।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং তাঁর সঙ্গীরা পিকিং সফর করেন এবং সেখানে সাংস্কৃতিক, শিল্প ও কৃষি এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। তাঁরা হাঙচোউ এবং সাংহাইয়ে যান। সেখানে চীনা নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চলতে থাকে এবং

তাঁরা একই ধরনের এলাকাগুলি সেখানেও পরিদর্শন করেন।

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা, এত বছর বিচ্ছিন্ন থাকার পরে, বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর অকপট মত বিনিময় করার সুযোগে লাভবান হবেন বলে মনে করেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এবং বিরাট উথালপাথাল ঘটে যাচ্ছে, তা নিয়ে তাঁরা পর্যালোচনা করেন, তাতে উভয়পক্ষ নিজের নিজের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করেন।

ইউ.এস.-এর পক্ষ থেকে বলা হয় : এশিয়া এবং বিশ্বে শান্তির জন্য আশু উত্তেজনা কমিয়ে আনা এবং সংঘাতের মূল কারণগুলি দূর করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। ইউনাইটেড স্টেট্স ন্যায়সঙ্গত ও সুনিশ্চিত শান্তির জন্য কাজ করবে : ন্যায়সঙ্গত, কারণ তাতে জনসাধারণ ও জাতিগুলির স্বাধীনতা ও প্রগতির আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে; সুনিশ্চিত, কারণ তাতে বিদেশি আগ্রাসনের বিপদ দূর হবে। ইউনাইটেড স্টেট্স বাইরের চাপ অথবা হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সামাজিক প্রগতিকে সমর্থন করে। ইউনাইটেড স্টেট্স মনে করে, ভিন্ন আদর্শের দেশগুলির মধ্যে সংযোগ ঘটানোর মাধ্যমে উত্তেজনা কমানোর উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়। এতে দুর্ঘটনা, ভুল হিসাব অথবা ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা সংঘাতের ঝুঁকি কমিয়ে আনা যায়। দেশগুলি পারস্পরিক মর্যাদা সহকারে একে অপরের প্রতি ব্যবহার করা উচিত এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজি থাকা উচিত, কর্মদক্ষতা হোক বিচারের চূড়ান্ত মাপকাঠি। কোন দেশই নিজেকে অভ্রান্ত দাবি করতে পারে না এবং প্রত্যেক দেশকে সকলের ভালোর জন্য নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে পুনর্বিচার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। ইউনাইটেড স্টেট্স জোর দেয়, ইন্দোচীনের জনসাধারণকে বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে দিতে হবে; এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য থাকবে আপস-মীমাংসার মাধ্যমে সমাধান; ২৭ জানুয়ারি ১৯৭২ ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র এবং ইউনাইটেড স্টেট্স যে ৮-দফা প্রস্তাব সামনে নিয়ে এসেছে, ওই উদ্দেশ্যকে পূরণ করার ভিত্তি হবে ওটাই; একটা আপস-মীমাংসার অনুপস্থিতিতে ইউনাইটেড স্টেট্স ইন্দোচীনের প্রত্যেকটি দেশের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ওই অঞ্চল থেকে সমস্ত আমেরিকান বাহিনী চূড়ান্তভাবে তুলে নেওয়ার কথা বিবেচনা করছে। কোরিয়ান উপদ্বীপে উত্তেজনা প্রশমন এবং সংযোগ বৃদ্ধি করার জন্য ইউনাইটেড স্টেট্স প্রজাতন্ত্রী কোরিয়াকে সমর্থন করবে এবং তার সঙ্গে নিবিড় বন্ধন বজায় রাখবে। ইউনাইটেড স্টেট্স জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ককে সর্বাধিক মূল্য দেয়; সে এই সুদৃঢ় বন্ধনকে উন্নত করার কাজ চালিয়ে যাবে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২১ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইউনাইটেড স্টেট্স ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি জারি রাখার পক্ষে এবং জম্মু ও কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি রেখার দুই পারে এই দুই দেশের নিজের অংশে এবং নিজের ভূখণ্ডের মধ্যে সমস্ত সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করার পক্ষে; ইউনাইটেড স্টেট্স শান্তিতে, সামরিক ভীতি প্রদর্শন মুক্ত এবং অঞ্চলটিকে বৃহৎ ক্ষমতার বিরোধের ক্ষেত্র না করে তুলে দক্ষিণ এশিয়ার জনসাধারণের নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার অধিকারকে সমর্থন করে।

চীনা পক্ষ থেকে বলা হয় : যেখানে অত্যাচার, সেখানেই প্রতিরোধ। দেশ চায় স্বাধীনতা, জাতি চায় মুক্তি আর জনগণ চায় বিপ্লব — এটা ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত জাতি, ছোটো অথবা বড়ো, সকলে হবে সমান; বড়ো জাতি ছোটোকে উৎপীড়ন করবে না এবং শক্তিশালী জাতি দুর্বলকে উৎপীড়ন করবে না। চীন কখনই একটা সুপারপাওয়ার হবে না এবং সে যে কোন ধরনের আধিপত্য ও ক্ষমতার রাজনীতিকে বিরোধিতা করে। চীনা পক্ষ থেকে বলা হল, স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সমস্ত নিপীড়িত জনগণ ও জাতির সংগ্রামকে সে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এবং সকল দেশের জনগণের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী সমাজব্যবস্থা বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে; নিজেদের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত ঐক্যকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে; বিদেশি আগ্রাসন, হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ ও পরাভূত করার বিরোধিতা করার অধিকার রয়েছে। সমস্ত বিদেশি সেনাকে নিজের নিজের দেশে ফিরিয়ে নিতে হবে।

চীনা পক্ষ থেকে ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ার জনসাধারণের নিজস্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্যোগকে দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়; প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের সাত-দফা প্রস্তাবকে, এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে এই প্রস্তাবের দুটি প্রধান সমস্যার ওপর বিস্তারিত বক্তব্যকে এবং ইন্দোচীনের জনসাধারণের শিখর সম্মেলনের যুক্ত বিবৃতিকে দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। ১২ এপ্রিল ১৯৭১ গণতান্ত্রিক জন-প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া সরকারের পেশ করা কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ সংযুক্তির আট-দফা কর্মসূচিকে সে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাচ্ছে এবং "কোরিয়ার সংযুক্তি ও পুনর্বাসনের জন্য রাষ্ট্রসংঘের কমিশন" বাতিল করার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। সে জাপানি সামরিক শক্তির পুনরুজ্জীবন এবং দেশের বাইরে বৃদ্ধি ঘটানোর দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে এবং জাপানি জনসাধারণের একটা স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ জাপান গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। সে দৃঢ়ভাবে মনে করে ভারত-পাকিস্তান প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারত ও পাকিস্তানের অবিলম্বে জম্মু ও কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি রেখার দুই পারে এই দুই দেশের নিজের অংশে এবং নিজের ভূখণ্ডের মধ্যে সমস্ত সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করা উচিত; স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পাকিস্তানের সরকার ও জনসাধারণের সংগ্রামকে এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণের সংগ্রামকে সে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

চীন এবং ইউনাইটেড স্টেট্সের সমাজব্যবস্থা ও বিদেশনীতিতে অপরিহার্য কিছু তফাত রয়েছে। যাই হোক, দুই পক্ষ সম্মত হল, সমাজব্যবস্থা নিরপেক্ষ ভাবে, সমস্ত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত ঐক্যের প্রতি মর্যাদা, অন্য রাষ্ট্রের ওপর অনাক্রমণ, অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ, সাম্য ও পরস্পর সুবিধাদান এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ওপর ভিত্তি করে দেশগুলি তাদের সম্পর্ক গড়ে তুলবে। বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের রাস্তায় না গিয়ে আন্তর্জাতিক বিরোধগুলি এই ভিত্তিতে মীমাংসা হওয়া উচিত। ইউনাইটেড স্টেট্স এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই নীতিগুলিকে মনে রেখে দুই পক্ষ বলছে :

- চীন ও ইউনাইটেড স্টেট্সের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার দিকে অগ্রগতি সমস্ত দেশের স্বার্থে;
- উভয়েই আন্তর্জাতিক সামরিক সংঘাতের বিপদ কমিয়ে আনতে চায়;
- কেউই এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য কায়েম করতে চায় না এবং অন্য কোন দেশ অথবা কয়েকটি দেশের গোষ্ঠীর এই ধরনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগকে উভয়েই বিরোধিতা করবে; এবং
- কোন তৃতীয় পক্ষ থেকে আপস-মীমাংসা অথবা অন্য কারও সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশিত কোন সমঝোতা বা বোঝাপড়া করতে দুই পক্ষের কেউই প্রস্তুত নয়।

উভয় পক্ষ মনে করে যে, কোন বড়ো দেশ যদি অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে অন্য কারও সঙ্গে আঁতাত করে অথবা যদি বড়ো বড়ো দেশগুলি পৃথিবীকে নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী বিভক্ত করে, তাহলে তা বিশ্বের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে।

দুই পক্ষ চীন এবং ইউনাইটেড স্টেট্সের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলতে

থাকা বিরোধগুলিকে পর্যালোচনা করল। চীনারা নিজেদের অবস্থানকে আবার জানিয়ে দিল : তাইওয়ানের প্রশ্নটি চীন ও ইউনাইটেড স্টেট্‌সের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার পথে অন্তরায় এক গুরুতর প্রশ্ন; গণ–প্রজাতন্ত্রী চীনের সরকার হল চীনের একমাত্র আইনি সরকার; তাইওয়ান হল চীনের একটি প্রদেশ, যা অনেক আগেই তার মাতৃভূমির কাছে ফিরে এসেছে; তাইওয়ানের মুক্তি চীনের আভ্যন্তরীণ বিষয়, তাতে অন্য কোন দেশের নাক গলানোর অধিকার নেই। এবং সমস্ত ইউ.এস. বাহিনী ও সামরিক ব্যবস্থাপনা তাইওয়ান থেকে সরিয়ে নিতে হবে। "এক চীন, এক তাইওয়ান", "এক চীন, দুই সরকার", "দুই চীন", এবং "স্বাধীন তাইওয়ান" সৃষ্টির লক্ষ্যে যে কোন কার্যকলাপকে অথবা "তাইওয়ানের অবস্থান স্থির করা বাকি রয়েছে" এই প্রচারকে চীন সরকার দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে।

ইউ.এস. পক্ষ ঘোষণা করে : ইউনাইটেড স্টেট্‌স স্বীকার করে যে, তাইওয়ান প্রণালীর দুই পারে যে সমস্ত চীনারা বাস করে, সেটা একটাই চীন এবং তাইওয়ান চীনের অংশ। ইউনাইটেড স্টেট্‌স সরকার সেই অবস্থান নিয়ে আপত্তি তুলছে না। চীনারা নিজেরাই তাইওয়ান প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করুক, পুনরায় সে দৃঢ়ভাবে তা স্বীকার করছে। এটা দৃষ্টিতে রেখে সে তাইওয়ান থেকে সমস্ত ইউ.এস. বাহিনী ও সামরিক ব্যবস্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্যকে দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছে। এর মধ্যে এতদঞ্চলে উত্তেজনা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সে তার বাহিনী ও সামরিক ব্যবস্থাপনা কমিয়ে আনবে।

দুই পক্ষ একমত হয় যে দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়িয়ে তোলা দরকার। এই লক্ষ্যে তারা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং সাংবাদিকতার মতো নির্দিষ্ট সমস্ত ক্ষেত্রে আলোচনা করে, যেখানে জনগণের মধ্যে সংযোগ ও মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরস্পরই উপকৃত হবে।

উভয় পক্ষ মনে করে, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য হল আর একটা এলাকা যা থেকে উভয়ে উপকৃত হবে এবং তারা একমত হয়, সমানাধিকার ও পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক দুই দেশের জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল। তারা দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে একমত হয়।

দুই পক্ষ একমত হয়, তারা বিভিন্ন পথে যোগাযোগ বজায় রাখবে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে নির্দিষ্ট আলোচনা করার জন্য এবং দু'পক্ষের সাধারণ স্বার্থের বিষয়গুলির ওপর মত বিনিময় জারি রাখার জন্য একজন প্রবীণ ইউ.এস. প্রতিনিধিকে সময়ে সময়ে পিকিংয়ে পাঠানো হবে।

দুই পক্ষ আশা প্রকাশ করে যে, এই সফরে যেসব সুফল অর্জিত হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের নতুন সম্ভাবনা খুলে যাবে। তারা মনে করে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে কেবল চীনা ও আমেরিকান জনসাধারণ উপকৃত হবে না, বরং তাতে এশিয়া ও বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমনে লাভ হবে।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন, শ্রীমতী নিক্সন এবং আমেরিকান পক্ষ গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সরকার ও জনগণের মধুর আতিথেয়তার জন্য তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিষ–গর্ভা

ভারত সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রী জয়রাম মহেশের কাছে ভরত মনসাটা–র খোলা চিঠি

ভারতে বিটি বেগুন বিক্রি এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত আমাদের ভূমি এবং ভূমিজ মানব ও অমানব জীবনে আগামী কয়েক প্রজন্মের জন্য সর্বাধিক গুরুতর, সুদূরপ্রসারী ও অপরিবর্তনীয় ফলাফল নিয়ে আসবে। শোনা যাচ্ছে আরও পঞ্চাশটি জেনেটিকালি মডিফায়েড শস্য ভারতে আসতে চলেছে, এগুলি সম্পর্কে আমাদের চরম সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। একবার মুক্তি পেলে, এগুলি ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই, এর থেকে উদ্ভুত শৃঙ্খল-বিক্রিয়াও থামিয়ে দেওয়া যায় না। তর্কাতীতভাবে সৎ ও খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এবং বিপুল সংখ্যক চাষি ও ভোক্তা সহ ভারতীয় নাগরিকদের এক ব্যাপক অংশ বিটি বেগুনের অনুমোদন নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, এর ফলে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে; মানুষ, পশু এবং পরিবেশের ক্ষতি হবে। এগুলো মোটেই এমন মামুলি বিষয় নয় যে সাত তাড়াতাড়ি অনুমোদন দিয়ে বিটি বেগুনকে দেশের মানুষের গলাধঃকরণ করাতে হবে। এই সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিষয় খতিয়ে দেখে এবং তার সন্তোষজনক সমাধান করে বিটি বেগুনের মতো অত্যন্ত বিতর্কিত শস্য সম্পর্কে বিবেচনা করাই বিচক্ষণতার পরিচয়। আপনি অনেকের কাছেই শুনে থাকবেন, ভারতের মানুষ কারও 'পরীক্ষাগারের ইঁদুর' বা বলির পাঁঠা হতে চায় না।

কলকাতা ও ভুবনেশ্বরে আপনাদের জনশুনানি থেকে এটা নিঃসন্দেহে পরিষ্কার যে উড়িষ্যা, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ — যে তিন রাজ্য ভারতের ৬০% বেগুন উৎপাদন করে — নিরঙ্কুশভাবে বিটি বেগুন অনুমোদনের বিরোধিতা করেছে। আমরা জানতে পেরেছি, এই তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনার কাছে লিখিতভাবে তাঁদের বিরোধিতা নথিভুক্ত করেছেন। তাঁরা এটাও জানিয়েছেন, যেহেতু কৃষি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়, কেন্দ্র অযাচিতভাবে বিটি বেগুনকে তাঁদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। যদিও ভারতের কোনখানেও বিটি বেগুন অনুমোদন পেলে তা অবশ্যম্ভাবী 'বেসরকারি' পথে প্রতিবেশি রাজ্যেও ঢুকে পড়বে।

অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্নাটক, কেরালা ও মধ্যপ্রদেশ সমেত অন্তত আরও পাঁচটি বড়ো রাজ্য তাদের নাগরিক ও প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করতে বিটি বেগুনের ছাড়পত্রের বিরোধিতা করেছে। অবশ্য এই রাজ্যগুলির অনেকে জিএম শস্যের সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার পক্ষে। এই বিষয়ে আরও মূল্যায়ন বা তর্ক ব্যতিরেকে কোনও রাজ্য কি আজ পর্যন্ত বিটি বেগুনের পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং বিক্রির বিষয়টা ত্বরান্বিত করার ওকালতি করেছে? যদি তা করে থাকে, তাহলে দয়া করে জানান, কোন কোন রাজ্য কী ধরনের জরুরি যুক্তি তার সপক্ষে হাজির করেছে।

১৩ জানুয়ারি কলকাতার জনশুনানিতে আমি সংক্ষেপে আমার কথা বলতে পেরেছিলাম। সেখানে আমি 'দ্য গ্রেট এগ্রিকালচারাল চ্যালেঞ্জ' এবং 'অর্গানিক রেভলিউশন' নামে আমার প্রাসঙ্গিক বই দুটি আপনাকে উপহার দিয়েছিলাম। আপনার সেদিনের অনুরোধ অনুযায়ী, আমি এখন আমার বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করছি।

1. যে বিটি বেগুন 'ব্যাসিলাস থারিনজিয়েনসিস (বিটি) নামে এক ব্যাক্টেরিয়া জিন ধারণ করে, যা নিজেই তার কীটনাশক নিঃসৃত করে, সেই বেগুনের জন্য ভারতকে বিশ্বের প্রথম গিনিপিগ হওয়ার এই দৃষ্টিকটু তাড়াহুড়োর কারণ কী? যে বেগুন 'বিষ–গর্ভা' হিসেবেই নির্মিত! যদি ভারত অনুমোদন করে, এটাই হবে বিশ্বের কোথাও প্রথম বিটি–খাদ্য, যা তন্তু বা পশুখাদ্য হিসেবে নয়, মনুষ্য–খাদ্য হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত হবে।

2. জেনেটিকালি মডিফায়েড বা জিএমের জগতে ভারতের প্রবেশ ঘটেছিল বিটি কটন মারফত। ওই গাছ থেকে উৎপন্ন বিষের লক্ষ্য ছিল তুলোগাছের পোকা, কিন্তু সেই বিষ কোথায় তার নিধন থামাবে জানত না। বিটি শস্যের অবশেষ থেকে মাঠে চরা হাজার হাজার গবাদি পশু মরে গেল। এই বিটি তুলোর চাষ করতে গিয়ে হাজার হাজার চাষি আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। আর এরপরও আমাদের বেগুনের বরাতে বিটি প্রযুক্ত করা বাকি? একটা পছন্দের সবজি, গরিব-বড়োলোক সবাই খায়, দামেও সস্তা আর যথেষ্ট পাওয়া যায়। কেন? কী দরকার? সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া মুশকিল।

3. জৈব বহু-ফলন (মিশ্র চাষ), যেখানে দেশি নানান জাতের বেগুন আর অন্য সবজি/গাছ ঠিকমতো ফলানো যায়, সেখানে তেমন পোকামাকড়ের সমস্যা থাকে না। আমাদের দেশের ঐতিহ্যশালী/জৈব চাষিদের এটাই অভিজ্ঞতা। 'কীটনাশকবিহীন পরিচালন' (নন-পেস্টিসিডাল ম্যানেজমেন্ট বা এনপিএম)-এর বিবিধ রণনীতি সফলভাবে পোকামাকড় প্রতিরোধ করতে পারে। যদি এই ধরনের ঐতিহ্যগতভাবে খাঁটি চাষবাসের পদ্ধতিগুলি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হয়, তাহলে কোন বিটি শস্য অথবা কৃত্রিম রাসায়নিক কীটনাশকের দরকার পড়ে না। এ হল অপেক্ষাকৃত খাঁটি, নিরাপদ, সহজ মডেল, যা থেকে ধারাবাহিকভাবে পোষণযোগ্য ও সমন্বিত উপায়ে বহু উপকার পাওয়া যায়, এটাই ভারতের অনুসরণ করা উচিত এবং পরিবেশ ও বনমন্ত্রককে সক্রিয়ভাবে তা প্রচার ও সমর্থন করা উচিত।

4. যেখানে বেগুনের অপোষণযোগ্য একমাত্র চাষে অপরিহার্যভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহার হয়, সেখানেও চাষিরা পোকার উপদ্রব অনুযায়ী কীটনাশকের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বিটির ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণের কোন সুযোগ নেই। জিনগত পরিবর্তিত শস্য অনিয়ন্ত্রিতভাবে ক্ষতিকর কীটনাশকের জন্ম দেয়। গাছের প্রত্যেক অংশে এবং কোষে; পাতা, শিকড় আর ফলে গভীরভাবে বিন্যস্ত থাকে। সেক্ষেত্রে বিষ ধুয়ে ফেলা ইত্যাদির কোন সম্ভাবনা থাকে না। বিষের ক্ষমতা থেকে একদম রেহাই নেই!

5. ক্রেতাদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্য বিটি বেগুনের কোন বাধ্যতামূলক লেবেল সাঁটার দরকার পড়ে না, তাদের অবাধ পছন্দের অধিকারকে উপহাস করা হয়। এইভাবে আমাদের সংবিধানে লেখা মৌলিক মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করা হয়।

6. প্রতীকিভাবে নয়, বরং সময়-পরীক্ষিত নিরাপত্তার ভিত্তিতে ক্রেতাদের খাদ্য পছন্দের অবিচ্ছেদ্য অধিকারকে মর্যাদা জানাতে আপনাদের ভাবা উচিত কীভাবে বিটি/জিএম খাদ্যের বাধ্যতামূলক লেবেল থাকা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। এর কঠোর প্রয়োগের অনুপস্থিতিতে, আপনাকে দৈত্য (বিটি) আর তার লেজ, উভয়ের অনুমোদনে আপত্তি করা উচিত।

7. ক্রেতা, ক্রেতা-সংগঠন, চিকিৎসক এবং মায়েরা সতর্ক করে দিয়েছেন, যদি বিটি বেগুন বাজারে ঢুকে পড়ে, তাহলে জনসাধারণের এক উল্লেখযোগ্য অংশ, যারা এর বিপদ সম্পর্কে সচেতন, তাদের হয়তো বেগুন খাওয়াই ছেড়ে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে তারা একটা সস্তা এবং 'ভিটামিন, খনিজ ... অ্যামাইড প্রোটিনের দারুণ উৎস' — আমাদের নানান দেশি জাতের বেগুন — থেকে বঞ্চিত হবে। এই ধরনের পুষ্টিদায়ক খাদ্য বিশেষত গরিবদের কাজে লাগে, যাদের রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব।

8. ফলন এবং বিক্রির মোট পরিমাণের দিক থেকে আলুর পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বেগুন। সারা ভারতে সবচাইতে সাধ্যের মধ্যে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কেন আমরা ইচ্ছে করে তাকে ধ্বংস করব? আর তাতে অর্থনৈতিকভাবে কে লাভবান হবে?

9. চার হাজার বছরের ওপর এই উপমহাদেশে বেগুন জন্মাচ্ছে, বিশ্বে এই বেগুনের বৈচিত্র্য এবং উদ্ভবের কেন্দ্র ভারত। আড়াই হাজার ধরনের বেগুন এখানে নথিভুক্ত রয়েছে! এখনও যে শত শত দেশি বেগুনের জাত রয়েছে, বিটি বেগুন ছাড়পত্র পেলে নিশ্চিতভাবে তা ক্রমান্বয়ে এগুলির দফারফা করবে। যাকে বলা হয় 'ইনস্টেবিলিটি অফ ট্রান্সজেনিক লাইন্স', তা কেবল চাষবাসের কার্যক্ষমতাকে আক্রান্ত করে না, অনুভূমিক জিন স্থানান্তর ও পুনর্গঠনকে বাড়িয়ে দিতে চায়। তাই এখনই বিটি বেগুনকে আটকাতে না পারলে আর সময় থাকবে না। এটা না করতে পারলে চাষিদের চাষ করা এবং বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া ধ্বংসাত্মক বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত নিজেদের ঐতিহ্যগত পছন্দের বীজগুলো রক্ষা করার মৌলিক অধিকার খর্বিত হবে।

10. বিটি বেগুন ছাড়পত্র পেলে আমরা জীববৈচিত্র্যের ওপর 'কার্টাজিনা প্রটোকল'-ও লঙ্ঘন করব। জীববৈচিত্র্যের ওপর রাষ্ট্রসংঘের এই কনভেনশনে ভারতও স্বাক্ষরকারী। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল, যে শস্যের উদ্ভব ও বৈচিত্র্যের কেন্দ্র পৃথিবীর যে অঞ্চল, সেই শস্যের জিএম রূপটি সেই অঞ্চলে ফলানো নিষিদ্ধ। যেমন, ভারতের ক্ষেত্রে বেগুন। বিটি বেগুনের ছাড়পত্র প্রদান তাই সবচেয়ে হঠকারী এবং ক্ষমার অযোগ্য একটি সিদ্ধান্ত হবে। এতে ক্ষতি হবে ভারত এবং গোটা পৃথিবীর। ২০১০ সালের 'আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য বর্ষ'-এর এ এক সেরা দুর্ভাগ্য।

11. কয়েক সহস্র বছর আগে থেকে ধান সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজাত শস্যের উদ্ভব ও বৈচিত্র্যের কেন্দ্র এই ভারতে অন্তত দুটি অসাধারণ সমৃদ্ধ, কর্ষণহীন, দেশীয় জীববৈচিত্র্যের বিশ্ব-কেন্দ্র রয়েছে — পশ্চিমঘাট ও উত্তর-পূর্ব ভারত —— নতুন জিনগত ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাতির থেকে এই কেন্দ্র-দুটি বিপন্ন হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

12. ২০ জানুয়ারি ২০১০ সুপ্রিম কোর্ট ভারত সরকারকে বলেছে, ভারতের ঐতিহ্যশালী শস্য ও উদ্ভিদগুলিকে সম্ভাব্য সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মাঠে জিএম বীজের যে পরীক্ষানিরীক্ষা তারা করেছে, নিয়মাবলী ও কার্যপদ্ধতি সহ তার পদক্ষেপগুলি পুংখানুপুংখ বর্ণনা করতে হবে। বিটি বেগুনের ক্ষেত্রেও আপনার মন্ত্রকের কাছে আমরা জানতে চাইব, আমাদের দেশি শস্য ও গাছগুলিকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কী কী বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ আপনারা নেবেন। বিটি বেগুন এবং পুরনো দেশীয় প্রজাতিগুলির মধ্যে তিনশ মিটার দূরত্ব রাখার যে সর্বনিম্ন সুপারিশ রয়েছে, ব্যবসায়িক বিটি উৎপাদক, গবেষক বা কর্পোরেটরা সেটা যাতে লঙ্ঘন না করে, কীভাবে তা আপনারা সুনিশ্চিত করবেন?

13. পশ্চিমবঙ্গে একশ'র বেশি দেশীয় প্রজাতির চাষের মাধ্যমে ভারতের মোট বেগুন উৎপাদনের ৩০% ফলন হয় — এই চাষে ৯০%-এর বেশি ছোটো ও প্রান্তিক চাষি যুক্ত, পরস্পর ঘেঁষাঘেষি করে তারা চাষ করে। অতএব সেখানে ত্রিশ মিটার তফাত রাখাও খুবই মুশকিল অথবা অসম্ভব। একই ঘটনা উড়িষ্যা, বিহার এবং অন্য বহু রাজ্যে। তাহলে কীভাবে আপনারা সেখানে ছোটো চাষি আর তাদের দেশীয় প্রজাতিগুলিকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবেন? বেগুনের আড়াআড়ি পরাগ-মিলন তিন হাজার কিলোমিটার বা ততোধিক দূরত্বেও সম্ভব। সেখানে প্রকৃতি, মৌমাছি ইত্যাদি পরাগ-বাহকেরা আপনাদের প্রস্তাবিত তিনশ মিটারের সীমা লঙ্ঘন করবে না, এটা কীভাবে আপনারা সুনিশ্চিত করবেন?

14. বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-অধ্যক্ষ এবং অভিজ্ঞ কৃষিবিজ্ঞানী অধ্যাপক টি কে বসু হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, বিটি বেগুন ছাড়পত্র পেলে সমস্ত সোলাঙ্কি পরিবারভুক্ত শস্য — বেগুন যে পরিবারের অন্তর্গত — সংক্রামিত হবে। এর মধ্যেই রয়েছে আলু, টমাটো এবং

লঙ্কা। ক্রেতা ও চাষিদের পুষ্টি ও জীবিকাগত সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয়কারী ভবিষ্যতের লক্ষণ দেখা দেবে। আগেই বলেছি, ভারতে সবচেয়ে বেশি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত সবজি আলু, তারপরেই বেগুন — দুটোই সোলাঙ্কি পরিবারভুক্ত।

15. কলকাতার জনশুনানিতে আপনাকে এটাও জানানো হয়েছে, যে সমস্ত ফল/অঙ্কুর পোকায় কাটে, যেগুলিকে বিটি রক্ষা করবে বলে দাবি করা হচ্ছে, বেগুনের অর্থকরী এক-চাষের ক্ষেত্রে ওই পোকার ধরনটা হল পনেরো বা তারও বেশি কীটের মধ্যে মাত্র দুটি। এই চাষে যারা যুক্ত তারা জানে, বিটি বেগুন লাগালে কীটনাশকের ব্যবহার তেমন তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমবে না; বরং তাদের আশঙ্কা শীঘ্রই আরও রাসায়নিক (সার ও কীটনাশক দুটোই) লাগাতে পারে।

16. বেশিরভাগ দেশেই জিএম শস্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ব্রিটেন, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া সহ ইউরোপের অনেকখানিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ডব্লুটিও-কে অগ্রাহ্য করে এই নিষেধাজ্ঞা চলছে। বিশ্বের ৮৫% জিএম চাষ সীমাবদ্ধ রয়েছে মাত্র চারটি দেশে — আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল; সেখানে মাত্র চারটি — ভুট্টা, সয়াবিন, তুলা ও কানোলা — জিএম শস্য চাষ হয়।

17. জিএম নীতি ও আইনকানুন পর্যালোচনাকারী ভারতীয় প্ল্যানিং কমিশনের টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান সুমন সহায় সুপারিশ করেছেন, আমাদের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থাটা প্রথমে ভালোরকম উন্নত করতে হবে এবং সমস্ত বিকল্পগুলিকে খতিয়ে দেখতে হবে। তার আগে জিএম শস্যের কোন বাণিজ্যিক ছাড়পত্র দেওয়া উচিত নয়। সেই সতর্কতাকে আমল না দিয়ে ধান, ঘুঘু-মটর, সর্ষেকে ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলক চাষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; এর পরেই আসছে গম, জোয়ার, রাগি, বাজরা, ভুট্টা, কাসাভা, আলু, পেঁয়াজ এবং বিভিন্ন ডাল, তৈলবীজ, সবজি, ফল ও মশলা। মনে হয়, বিটি বেগুন প্রথম একটা পরীক্ষামূলক ঘটনা। এরপরই অন্য শস্যের জন্য বাঁধ খুলে যাবে, এখন থেকে সতর্ক না হলে সেদিকেই যাবে।

18. ডঃ পুষ্পা ভার্গভ — বিশ্ব খ্যাত বিজ্ঞানী, পদ্মভূষণে সম্মানিত, সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজির প্রাক্তন ডিরেক্টর এবং জাতীয় জ্ঞান কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান — জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভাল্‌স কমিটি (জিইএসি)-কে দেখাশুনার জন্য সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা মনোনীত হয়েছেন। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন : "বিভিন্ন সম্মানিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন সুপরিচিত বিজ্ঞানীদের দ্বারা লিখিত বহু গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, ... বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা বিজ্ঞান পত্রিকায় সেগুলি ছাপা হয়েছে," — এগুলি জিইএসি-র নজরে আসেনি; তিনি বিচারহীনভাবে জিএম শস্যের ছাড়পত্র দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন; যত ক্ষতিই এই শস্য করুক না কেন, তা বন্ধ করার কোন উপায় থাকে না। ডঃ ভার্গভ বলেছেন, "... ত্রিশটির মতো পরীক্ষা দরকার ... মনসান্টো দশটিও করেনি; আর আমাদের দেশের হাতে এমন কোন ব্যবস্থা নেই, যা দিয়ে সত্যিই পরীক্ষাগুলি করা হয়েছে কিনা যাচাই করা যায়, সেগুলির যথার্থতা তো পরের কথা ... এইসব পরীক্ষতেও অনেক বৈজ্ঞানিক গলদ রয়েছে, মনসান্টোর দেওয়া সমস্ত নমুনাতেই এই গলদ ছিল। এই কোম্পানিটা নিজেদের অবিশ্বস্ত প্রমাণ করেছে ... মাটির জীবাণু-প্রজাতিগুলির ওপর বিটির প্রভাব নিয়ে কোন সমীক্ষা করা হয়নি; মাটির পুষ্টিকর পদার্থ অথবা গবাদি পশুর মাইক্রোফ্লোরার ওপরও কোন পরীক্ষা করে দেখা হয়নি ... এটা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, বিগত দশকে আমেরিকায় স্বাস্থ্য সমস্যার বৃদ্ধি জিএম ভুট্টা ও সয়া বেশি বেশি খাওয়ার ফলে দেখা দিয়েছে।"

19. মনসান্টো-মাহিকো'র জৈব-নিরাপত্তা পরিসংখ্যান জনসমক্ষে আনার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে এক জনস্বার্থ মামলার পর সেই পরিসংখ্যানগুলির বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক সেরালিনি-র নেতৃত্বে ফ্রান্সের 'কমিটি ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড ইনফর্মেশন অন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং' (সিআরআইআইজিইএন)। তিনি মন্তব্য করেন, "বিটি বেগুন যদি পরিবেশ-ছাড়পত্র পায়, তা মানুষ ও পশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে গুরুতর ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে এবং তা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।" এটা তুলে ধরা হয়, দীর্ঘতম বিষক্রিয়ার পরীক্ষা যা করা হয়েছে, তা মাত্র ৯০ দিনের। এ থেকে বিটি শস্য গ্রহণে পরবর্তী প্রজন্মের ওপর প্রভাব অথবা ক্যানসারের টিউমারের মতো দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়াগুলি শনাক্ত করা যায়নি। মনসান্টো, মাহিকো অথবা ভারত সরকার কি নাগরিকদের তিন মাসের বেশি বিটি বেগুন না খাওয়ার পরামর্শ দেবে?

20. যদি মনসান্টো আর মাহিকো বিটি বেগুনের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিত হয়, সেক্ষেত্রে কী ধরনের দায়দায়িত্ব নিতে তারা আইনগতভাবে বাধ্য থাকবে, যদি পরবর্তী ৫, ১০ বা ২০ বছরের মধ্যে এর কোন স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত খারাপ ফলাফল দেখা যায়?

21. বিটি বেগুন খাওয়ায় ছোটো শিশু, প্রসূতি মা, বৃদ্ধ এবং অসুস্থদের ওপর প্রভাব এবং একইসঙ্গে বিটির সঙ্গে বহু-বিষক্রিয়ার মিশ্র-প্রভাব নিয়ে আদৌ কোন সমীক্ষা করা হয়নি।

22. বাস্তবোচিত মূল্যায়নের কোন প্রকৃত স্বাধীন ব্যবস্থার জন্য ভারতকে নিজস্ব এক পরীক্ষাগার গড়ে তুলতে হবে। তার উচ্চ জন-বিশ্বস্ততা থাকবে এবং তা এমন সব নিরপেক্ষ কর্মী ও প্রশাসন দিয়ে চালাতে হবে, যেসব মানুষের প্রশ্নাতীত সততা থাকতে হবে, কোন জিএম উৎপাদন অথবা বিক্রয় সংস্থার সঙ্গে (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ) অর্থনৈতিক বা অন্য ধরনের যোগাযোগ থাকবে না। এই সংগঠন সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে, চোখকান খোলা রেখে সমস্ত প্রয়োজনীয় জৈব-নিরাপত্তা ও প্রাসঙ্গিক পরীক্ষা, তদারকি, মূল্যায়ন এবং বহু-প্রজন্মগত সমীক্ষার কাজ হাতে নেবে। এটা সুপ্রিম কোর্ট মনোনীত ডঃ ভার্গভ, 'জিএম নীতি ও আইনকানুন পর্যালোচনাকারী ভারতীয় প্ল্যানিং কমিশনের টাস্ক ফোর্স' এবং আরও অনেকেই জোর দিয়ে বলেছেন, যার মধ্যে রয়েছেন উচ্চ-প্রশংসিত বিজ্ঞানী ও অন্য নাগরিক। এধরনের স্বাধীন, বিশ্বস্ত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ছাড়া জিএম শস্যের কোন অনুমোদন হবে চোখ-বুজে-মেনে-নেওয়া বিজ্ঞান এবং নির্মিত/বিকৃত দ্বিতীয় শ্রেণীর তথ্যের ভিত্তিতে — বিদেশি অর্থনীতি ও রাজনৈতিক স্বার্থের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল।

23. বীজ এবং অন্য সামগ্রীর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিশ্ব-কৃষির রণনৈতিক দখল হিঁচড়ে আদায় করে নেওয়ার বাসনা মনসান্টোর মতো বহুজাতিকেরা গোপন করে না। ইতিমধ্যে যে মুষ্টিমেয় বহুজাতিক বীজের বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে, এদের মধ্যে বিতর্কিত জিএম শস্যের ক্ষেত্রে মনসান্টো অবিসংবাদিত নেতা। ভারতের মধ্যেও এখন এক বিলিয়ন ডলার সংগঠিত বীজের বাজারের অর্ধেকের বেশি আমেরিকা এবং আমেরিকান বহুজাতিকদের দখলে। সৌভাগ্যজনকভাবে, ভারতীয় চাষিদের প্রায় ৮০% এখনও বীজ সুরক্ষা, আদান-প্রদান ও সরাসরি বিনিময়ের ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছে; বীজ তারা কেনে না। চাষিদের এই অংশটাই বহুজাতিকদের মূল টার্গেট।

24. মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলার জৈব-চাষি শ্রী বসন্ত ফুটানে দেখিয়েছেন, তাঁর এলাকায় বিটি ছাড়া অন্য কোন তুলোবীজ এখন বিক্রি হয় না; স্থানীয় চাষিদের সেখানে (অন্ধ্রপ্রদেশের মতোই) বিটি কেনা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এটা আগ্রাসী 'বাজার দখল'-এরই ফল। শ্রী

ফুটানে যোগ করেছেন, "পুরুষানুক্রমিকভবে চলে আসা আমাদের স্বাস্থ্যকর দেশি বীজগুলি অবশ্যম্ভাবীভাবে সংক্রামিত হয়েছে। আমাদের বীজগুলিকে দূষিত করার কী অধিকার জিএম কোম্পানিদের আছে? এগুলি তো ভারতীয় কৃষির জীবন, লক্ষ লক্ষ স্বনির্ভর মানুষের জীবিকা।"

25. অধ্যাপক আর এন বসু-র সভাপতিত্বে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল কমিশন তার ২০০৯ সালের প্রতিবেদনে সুপারিশ করেছে, "যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত প্রাসঙ্গিক নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের বিষয়গুলি যথাযথভাবে দেখা হচ্ছে এবং সমাধান করা হচ্ছে, জিএম শস্যের সমস্ত ক্ষেত্র-পরীক্ষা ও বাণিজ্যিক চাষ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রাখা দরকার।" বিটি/জিএম শস্যের ছাড়পত্রকে অন্য যেসব রাজ্য বিরোধিতা করেছে, তার মধ্যে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক ও কেরালা। অন্য অনেক রাজ্য, যেমন তামিল নাড়ু, বিটি বেগুনের অনুমোদনে কিছু আপত্তি তুলেছে, অর্থাৎ এই বিষয়ে কোন চটজলদি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা তাদের রয়েছে।

26. সার্বিকভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার এবং বিটি তুলো ও অন্য জিএম শস্য দিয়ে সেচ করা তাৎপর্যপূর্ণভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এটাই বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা। বড়ো জিএম বীজ কোম্পানি — যেমন মনসান্টো, দু পোঁ, সিনজেন্টা, বেয়ার — বিশ্বের বড়ো কীটনাশক কোম্পানিও বটে। যে ব্যবসায় তাদের দারুণ উন্নতি হয়েছে, সেই রাসায়নিক বিক্রি কমিয়ে দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণ হবে না।

27. ভারতের 'এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্টস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড'-এর সভাপতি উল্লেখ করেছেন, জিএম শস্যের এলাকা মাত্র ৬% বৃদ্ধি পেলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার দ্বিগুণ হয়ে যাবে! আর ইতিমধ্যেই ভারতে বার্ষিক সারের ভর্তুকি খাতে ব্যয় হচ্ছে ১.২ লক্ষ কোটি টাকা — এক বিশাল অঙ্ক বছর বছর উর্ধগামী — এমনকী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পরিবেশগত বিপর্যয়, জলের সঙ্কট, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং জীবিকা হারানোর বিরাট হিসাব-বহির্ভূত খরচ বাদ দিয়েও এটা কৃষির শিল্পায়ন মডেলের সহজাত অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনাকেই পুরোদস্তুর প্রকাশ করে দেয়।

28. কানাডা সরকারের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, চার-পাঁচ বছর বাণিজ্যিক চাষের পর লতাগুল্ম-হন্তা প্রতিরোধকারী জিএম তৈলবীজ রেপ (কানোলা) অন্তর-পরাগমিলনের ফলে আগ্রাসী মহা-আগাছার জন্ম দেয়, এগুলি তিন জাতের লতাগুল্ম-হন্তা প্রতিরোধ করে। একইভাবে 'ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার' (ইউএসডিএ)-র পরিসংখ্যানের এক সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, জিএম ভুট্টা, সয়াবিন ও তুলো চাষের ফলে আগাছা-নির্মূলকারী লতাগুল্ম-হন্তার ব্যবহার ১৯৯৬ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে তেরো বছরে আমেরিকায় বেড়ে হয়েছে ৩১৮ মিলিয়ন পাউন্ড, কারণ লক্ষ লক্ষ একর চাষের জমি লতাগুল্ম-হন্তা প্রতিরোধকারী মহা-আগাছায় ভরে গেছে। ২০০৭ ও ২০০৮ সালের দু'বছরের যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে, তাতে এটা প্রায় ৪৬% বেড়েছে দেখা যাচ্ছে। ভারতের কৃষি-আবহাওয়ায় এই ধরনের সমস্যা আরও দ্রুতবেগে দেখা দেবে বলে মনে হচ্ছে।

29. বিটি কীট-হন্তা যে জিএম শস্য উৎপন্ন করে, তা দিন-কে-দিন অবাধ্যভাবে কীটের প্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছে। এর ফলে রাসায়নিক প্রয়োগ এবং 'মহা-কীট'-এর উৎপত্তি বাড়ছে। চীনে গোড়ায় মনে হয়েছিল যে বিটি তুলো শস্য কাটা গুবরে পোকাকে সফলভাবে দমন করছে। কিন্তু পরের বছরগুলিতে দেখা গেল, অন্য এমন কিছু পোকামাকড় বেড়ে গেল যেগুলি বিটিকে আরও প্রতিরোধ করে। ফলে আরও বেশি স্প্রে, আরও কড়া কীটনাশক — উত্তরোত্তর বিষের অবিরাম বাড়বাড়ন্ত। একইভাবে বন্দনা শিবা মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলের কথা বলেছেন, নানান জাতের পোকামাকড় ছড়িয়ে পড়ে কীটনাশকের ব্যবহার তেরো গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

30. দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বিটি উৎপাদনকারী শস্য উপকারী কীটপতঙ্গের — মৌমাছি ও প্রজাপতি সহ — এমন অপূরণীয় ক্ষতি করে, যা প্রথমে তার লক্ষ্য থাকে না। এটা সেই সমস্ত শস্যের ফলনের ওপর প্রভাব ফেলে, যেগুলি এই কীটপতঙ্গেরা পরাগ-মিলনের জন্য বহন করে নিয়ে যায়। মাটিতে বাস করে যেসব জীবানু ও পোকামাকড় — যা মাটির উর্বরা শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় এবং উপকারী দস্যু-কীট যেগুলি চাষিদের বন্ধু — এগুলিও বিটি শস্যের দ্বারা বিপন্ন হয়। (দস্যু-প্রজাতিগুলি কীটের সংখ্যাকেও নিয়ন্ত্রণে রেখে দারুণ উপকার করে।) কিন্তু কৃষি-ব্যবসায়ী বহুজাতিকেরা অবশ্যই এই জাতীয় 'সমান্তরাল ক্ষতি'র সম্পর্কে আঙুল তুলছে না।

31. ক্রমাগত দেখা যাচ্ছে, বিটি-বিষ খাদ্য-শৃঙ্খলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, দীর্ঘকাল থেকে যাচ্ছে এবং পুঞ্জিভূত হচ্ছে। এর ফলে মানুষ, পশু, জলজ জীব ও মাটিতে থাকা জীবানু ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হচ্ছে।

32. বিটি/জিএম শস্যের বীজ প্রত্যেক ঋতুতে উৎপাদনকারী সংস্থার কাছ থেকে বারবার কিনতে হয়। আমাদের দেশীয় বীজ যেভাবে চাষির নিজস্ব ফলন থেকে পুনরায় বপন করা যেত, এইসব পেটেন্ট নেওয়া বীজ থেকে তা হয় না। একবার দেশি স্থানীয় বীজ হারিয়ে গেলে অথবা জোগাড় করতে না পারলে অসহায় চাষিকে নিরুপায়ভাবে বহুজাতিকের বীজ কেনার জন্য উত্তরোত্তর খরচ করে যেতে হয়।

33. বিশ্বে ইতিমধ্যেই যতটা খাদ্য উৎপন্ন হয়, তা সমগ্র মানব সমাজকে খাওয়ানোর পক্ষে যথেষ্টর চাইতেও বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় একশ কোটি মানুষ খিদেয় কষ্ট পায় কিংবা অপুষ্টিতে ভোগে। কারণ সুলভ মূল্যে সেই প্রয়োজনীয় খাদ্য তারা পায় না। জিএমের বর্ধিত উৎপাদন খরচের ফলে বন্টনের অসাম্য এবং খিদে ক্রমাগত দরিদ্রতর শ্রেণীর মধ্যে বেড়ে যাবে; এছাড়া অপুষ্টি আর পুঞ্জিভূত বিষক্রিয়া তো আছেই।

34. 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ অর্গানিক এগ্রিকালচার মুভমেন্টস' (আইএফওএএম) বলছে, জৈবচাষে জিএম শস্য বিশ্বের সর্বত্র কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কোন শস্যে জিএমের উপস্থিতি থাকলে জৈব-শংসাপত্র পাওয়া যায় না; 'বিশ্ব অর্থনীতির সূর্যোদয় ক্ষেত্র'-এর জৈব- রপ্তানিতে এর গুরুতর ফলাফল রয়েছে।

35. দেশি বিভিন্ন প্রজাতির বেগুনের (রান্না করা নয়) আয়ুর্বেদিক ওষুধে ব্যবহার বিটি বেগুনের দূষণে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাতে প্রয়োজনীয় ওষুধ বিষাক্ত হয়ে পড়ে।

36. আর এক মারাত্মক ফলাফল ঘটে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধকারী জিএম শস্য ভক্ষণের ফলে, অ্যান্টিবায়োটিক সেক্ষেত্রে কাজ করে না। অনেক চিকিৎসক মনে করেন, এর ফলে বিভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি অকার্যকর হয়ে পড়বে, যেমন ড্রাগ-প্রতিরোধকারী টিউবারকুলোসিসের বিরুদ্ধে চিকিৎসা করা যাবে না।

37. কৃত্রিমভাবে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে জিন সরবরাহ করে জিএম-প্রযুক্তি স্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান হারে প্রকৃতির সজ্জা পাল্টে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বের প্রথম জিএম সবজি, এক ধরনের টমাটো (একটা মাছের জিন থাকার ফলে তার পেকে ওঠাকে বিলম্বিত করে) জনসাধারণের চাপে বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু যে জিনগত দূষণ তার থেকে শুরু হয়েছিল, সেটা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

38. অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে যে জিএম কর্পোরেট দানবেরা কাজ করে, যাদের

কোন বিবেকের পরিচয় পাওয়া যায় না, কীভাবে একটা বিছের জিন ঢুকিয়ে ধানের জিনগত পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে তাদের আটকানো যাবে, অথবা গমে একটা শুয়োরের জিন ঢোকানো বা চিনিতে গরুর জিন যুক্ত করা থেকে তাদের বিরত করা যাবে? সাধারণ দুষ্কর্মের বাইরে ইচ্ছাকৃত সাবোতেজ এবং জৈব-সন্ত্রাসও সম্ভব। একটা প্রবিষ্ট ব্যাকটেরিয়াগত বিষকে নির্মাণ করে তা মানুষের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর করে তোলা যায়। সংশ্লিষ্ট কোম্পানিরা এই ধরনের কোন তথ্য অবশ্যই গোপন করে, সরকারের নজর থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। পরীক্ষার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বিষক্রিয়া ধরা পড়তেও পারে, কিন্তু অন্য খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে সংঘাতের ফলে আবিষ্ট পচনশীল ক্ষতের কার্যকলাপ (কার্সিনোজেনিক অ্যাক্টিভিটি) বা বিষক্রিয়া ধরা পড়তে কয়েক দশক লেগে যেতে পারে। স্বাধীন পরীক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং অত্যন্ত সৎ ও যোগ্য মানুষদের একটা নিরপেক্ষ সংগঠনের দ্বারা স্বচ্ছ মূল্যায়ন ও তদারকির অনুপস্থিতিতে এই বিপদ বিশেষভাবে গুরুতর হয়ে ওঠে।

39. জিনগতভাবে বিকৃত 'টার্মিনেটর বীজ' বা 'আত্মঘাতী বীজ' প্রথমে তৈরি করে আমেরিকার কৃষি বিভাগ এবং কিছু বীজ-বহুজাতিক। এগুলির মধ্যে এমন এক 'টার্মিনেটর জিন' থাকে, যা উদ্ভিদকে ফলদায়ী বীজ উৎপন্ন করতে দেয় না। এই বন্ধ্যাত্ব নির্মাণের পিছনে আসল উদ্দেশ্য হল, চাষিকে নিজের চাষ থেকে বীজকে রক্ষা ও পুনর্চাষ না করতে দিয়ে প্রতিবছর বীজ কিনতে বাধ্য করা। কিন্তু একবার কোন অঞ্চলে টার্মিনেটর বীজ এলে, বন্ধ্যা বীজের প্রকোপ অন্য জিনগতভাবে নির্মিত নয় এমন শস্য ও উদ্ভিদে ছড়িয়ে পড়ে। এতে সেই অঞ্চলের বেশিরভাগ অথবা সমস্ত বীজ বন্ধ্যা হয়ে যায়! টার্মিনেটর জিনের এই স্থানান্তরের সম্ভাবনায় কারও দ্বিমত নেই। বাস্তবে সহজাতভাবে অস্থিতিশীল জিএম শস্য/উদ্ভিদের এইভাবে ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণ অস্বাভাবিকভবে বেশি। টার্মিনেটর বীজ নিয়ে বিশ্বব্যাপী সমালোচনার ফলে জীব-বৈচিত্র্যের ওপর ইউএন কনভেনশনে (২০০০) সুপারিশ করা হয়েছে, এগুলির ক্ষেত্র-পরীক্ষা ও বাণিজ্যিক বিক্রয় কার্যত নিষিদ্ধ হোক। ২০০৬-এ একই কথা বলা হয়েছে। অথচ এখন মনসান্টোর মতো কোম্পানি এই নিষেধাজ্ঞাকে তুলে নেওয়ার জন্য নতুন করে চাপ দিচ্ছে এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে 'জীব-নিরাপত্তা'-র আবরণে টার্মিনেটর বীজকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। যদি তারা সফল হয়, তাহলে তা মানবতা, কৃষি এবং বিশ্ব-প্রকৃতির পক্ষে এক তুলনাহীন বিপর্যয় হবে।

40. যদি চক্রান্তের তত্ত্ব ভুলে গিয়ে এই মুহূর্তে ধরে নেওয়া হয় যে, মনসান্টোর মতো কোম্পানিগুলি সহানুভূতিসম্পন্ন দেবদূত; তারা নিজেদের টাকা আর ক্ষমতার জন্য নয়, বরং 'অগ্রণী প্রযুক্তি'-র ক্ষমতাকে প্রগতি এবং মানব-কল্যাণের জন্য উদ্ভাবন করতে বেশি আগ্রহী; তাহলে সাতাশি বছর বয়স্ক এক অসাধারণ জৈব-চাষির এক চমৎকার বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাক। তাঁকে বলা হয় 'প্রাকৃতিক চাষের গান্ধী'। তিনি এম এস স্বামীনাথনকে লেখা এক খোলা চিঠিতে বলেছিলেন (দ্য গ্রেট এগ্রিকালচারাল চ্যালেঞ্জ, আর্থকেয়ার বুক্স) : "নিজ লক্ষ্যসীমার মধ্যে জিনগত-অদলবদল কিছু অতি সীমাবদ্ধ বৈশিষ্ট্যের 'কার্যক্ষমতা' সর্বাধিকভাবে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে; আরও বৃহত্তর পরিসরে এর প্রভাবের কথা না জেনেই তারা এটা করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি ধারণাতীতভাবে বিশাল একগুচ্ছ প্রক্রিয়ার পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করে চলে, পেশাদারি চিন্তাভাবনা বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের ধারণার সীমার অনেক বাইরে তার গতিবিধি। ওদের মাথায় কিছু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বার্থ থাকতে পারে, কিন্তু বিচিত্র উপাদান ও শক্তির বিস্ময়কর ঐকতান সম্পর্কে — স্বাস্থ্যসম্মত সামগ্রিক ভারসাম্য সৃষ্টির — চেষ্টা করার কল্পনা করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

41. ১,২০,০০০এর বেশি সদস্যভুক্ত এবং ৮০% ব্রিটিশ চিকিৎসকদের প্রতিনিধিত্বকারী 'ব্রিটিশ মেডিকাল অ্যাসোসিয়েশন' (বিএমএ) জনসাধারণকে সমস্ত জিএম খাদ্য বর্জন করতে বলেছে। তারা জিএম খাদ্যের সমস্ত পরীক্ষাও বন্ধ করতে বলেছে।

42. আরও সম্প্রতিকালে, ২০০৯ সালের এ মাসে আমেরিকার চিকিৎসকদের এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, 'আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ এনভায়রনমেন্টাল মেডিসিন' (এএইএম) জিএম খাদ্য সম্পর্কিত তাদের লিখিত অবস্থান জানিয়েছে। সেখানে তারা বলেছে, 'টক্সিকোলজি, অ্যালার্জি, ইমিউন ফাংশন, রিপ্রোডাক্টিভ হেল্‌থ এবং মেটাবলিক, ফিজিওলজিক ও জেনেটিক হেল্‌থ-এর ক্ষেত্রে (বিশেষত) গুরুতর স্বাস্থ্যগত বিপদ রয়েছে" জিএম খাদ্যের মাধ্যমে। তারা জিএম খাদ্যের ওপর একটা নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে; জিএম খাদ্যের দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা-পরীক্ষার আশু প্রয়োগ এবং জিএম খাদ্যের গায়ে লেবেল লাগানোর কথাও তারা বলেছে। এছাড়া, তারা সমস্ত চিকিৎসকদের তাদের রোগী, চিকিৎসা-সমাজ ও জনসাধারণকে জিএম খাদ্য পরিহার করার জন্য শিক্ষিত করার আবেদন রেখেছে।

43. মানুষকে জিএম খাদ্য খাওয়ানোর ওপর একমাত্র যে সমীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে জানা যাচ্ছে, জিএম খাদ্য থেকে কী ধরনের সবচেয়ে বিপজ্জনক সমস্যা হতে পারে। ওই ধরনের খাদ্যে যে জিন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তা ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ-তে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের খাদ্যনালীতে বাস করে এবং কাজ করতে শুরু করে। অতএব, জিএম খাদ্য খাওয়া বন্ধ করার অনেক পরেও আমাদের শরীরে ধারাবাহিকভাবে তৈরি হয়ে চলা ক্ষতিকারক সম্ভাবনাময় জিএম প্রোটিন থেকে যেতে পারে। সহজ করে বললে এরকম, বিটি ভুট্টা থেকে তৈরি চিপ্‌স এক টুকরো খেলে তা আমাদের খাদ্যনালীর ব্যাকটেরিয়াকে জীবন্ত কীটনাশক কারখানায় রূপান্তরিত করতে পারে, সম্ভবত আমাদের বাকি জীবন জুড়েই। তাই এই খবরে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, যেসব বিজ্ঞানীরা মনসান্টোর মতো কোম্পানির কাজ করে, যদি সম্ভব হয়, তারা নিজেরা জিএম খাদ্য খেতে অস্বীকার করে!

44. ষাটটি দেশের চারশ'র বেশি কৃষি-বিজ্ঞানীর এক আন্তর্জাতিক সমাবেশ চার বছরের এক সমীক্ষা ও সুচিন্তিত অধ্যয়নের পর তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট' (আইএএএসটিডি) প্রকাশ করেছে ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে। এতে সুপারিশ করা হয়েছে, দেশীয় জ্ঞানসম্পন্ন ক্ষুদ্রায়তন চাষি এবং কৃষি-পরিবেশগত পদ্ধতি আগামীদিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : ক্ষুধা, দারিদ্র ও আবহাওয়া পরিবর্তনের উত্তর জিএম শস্য নয়।

45. উপসংহারে শ্রী ভাস্কর সাভেকে উদ্ধৃত করে বলা যায় : "যদি আমরা দেখি, প্রকৃতির দান অসংখ্য সময়-পরীক্ষিত প্রজাতির জেনেটিক কোডে কোন কিছুর অভাব নেই, একমাত্র তখন আমরা উপলব্ধি করব যে তাদের জীবন স্বরূপ ডিএনএ-র কোন বিকৃতি ঘটানোর প্রয়োজন নেই। আর সেটাই সকলের মঙ্গলের জন্য অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সুখী পথ বিরাজমান — সর্বমঙ্গলম!"

আমি আশা করি এই কথাগুলি আপনাকে ভাবাবে এবং আপনি দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতে বিটি বেগুন বা অন্য কোন জিএম শস্যের অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করবেন।

অনুবাদ : জিতেন নন্দী

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।
ওয়েবসাইট : http://manthansamayiki.googlepages.com, ই-মেল : jiten_nandi@vsnl.net, দূরভাষ : 2491-3666